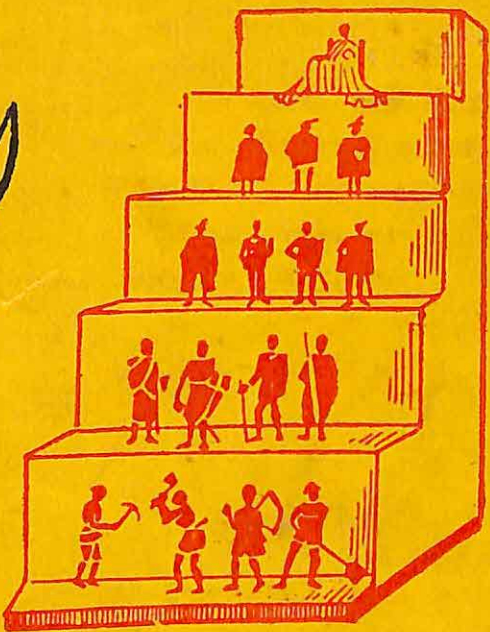
মানব-সভ্যতার ইতিহাস

(মধ্যযুগ)





Recommended by the West Bengal Board of Secondary
Education as a Text Book for Class VII, Vide
Notification No. TB, VII/H/81/28, dated. 8. 1. 81

মানব সভ্যতার ইতিহাস

(মধ্য যুগ)

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য

—ডক্টর কালীপদ হোড়, এম. এ., পি. এইচ ডি.
ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, রাণাঘাট গভঃ স্পনসর্ড কলেজ
এবং পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা-ভারতী
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীভবেশ চন্দ্র বিশ্বাস
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংশোধিত সংস্করণ—১৯৮১
দ্বিতীয় সংস্করণ—মার্চ ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৮৩
চতুর্থ সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৮৫

মূল্য : এগার টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস,
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

এই বই-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

- প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে সিলেবাসের প্রধান প্রধান বিষয়ের উল্লেখ।
- প্রতি অধ্যায়ের শেষে বিস্তারিত কালপঞ্জী।
- প্রতি অধ্যায়ের শেষে আলোচিত বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ।
- অনুশীলনীতে নানা ধরনের অজস্র প্রশ্ন।
- বই-এর শেষে বহু অতিরিক্ত প্রশ্ন।

Synopsis of the Syllabus on History for Class VII, 1981,

History of Medieval Civilization

1. Meaning of the term "medieval."
2. The Middle Ages in the West.
3. The myth of "dark age" in Europe.
4. The Byzantine civilization.
5. Islam and its impact.
6. Western Europe in Medieval period.
7. Feudalism in Medieval Europe.
8. The Crusades.
9. Growth of Towns.
10. The Far East in the Middle Ages (China & Japan).
11. India in the Middle Ages.
12. India's foreign contacts.
13. The Sultans of Delhi.
14. Towards the end of the Medievalera (14th and 15th centuries)

সূচীপত্র

মানব ইতিহাসের নানা যুগ

মধ্যযুগ কি ? ● নানা পরিবর্তনের ফলে মধ্যযুগ মিশে যায় আধুনিক যুগে ● ভারতের মধ্যযুগ ● যুগবিভাগ অবৈজ্ঞানিক ● বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগের বিভিন্ন চেহারা।

তোমরা যখন খুব ছোট ছিলে, ঠাকুমা, দিদিমার কোলে বসে ভূত-প্রেত, দত্যি-দানো, রাক্ষস-খোক্কস, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গের কত না গল্প শুনেছ! ভূত-প্রেত, দত্যি-দানো, রাক্ষস-খোক্কস অবশ্য কোনদিনই পৃথিবীতে ছিল না, এখনও নেই। তবে জীব-জন্তুরা আমাদের এই পৃথিবীরই বাসিন্দা। এই জীবজন্তুদের মধ্যে সেরা হল মানুষ। বুদ্ধি, অজানাকে জানার ইচ্ছা আর একতার জোরে আজ সে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। শুধু নিজের পৃথিবীর কর্তা হয়েই সে সন্তুষ্ট নয়। মহাকাশের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে পাড়ি দেবার চেষ্টাও সে চালিয়ে যাচ্ছে অবিরাম। এসো না, আজ এই মানুষেরই গল্প বলি! মানুষের গল্প তো আমাদের নিজেদের গল্প, আমাদেরই ইতিহাস। এ গল্প আমাদের উন্নতির ইতিহাস, অগ্রগতির কাহিনী।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ গরিলা বা ওরাং-ওটাং-এর মত দেখতে ছিল। ধীরে ধীরে সে দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখল, তৈরী করল হাতিয়ার বা অস্ত্র। বহুদিনের চেষ্টায় তার মুখে ফুটল ভাষা। শুরু হল তার জয়যাত্রা। আগুনের ব্যবহার শিখে, ঘর-বাড়ী বানিয়ে, চাষবাস করে, কাপড়-চোপড় বুনে, মাটির বাসনকোসন, চাকা তৈরী করে সে রীতিমত সভ্য হয়ে উঠল। অজস্র যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তার হাতে এসে যাওয়ায় তাকে আর পায় কে! এর কিছু পরেই সে লিখতে শিখল। লিখতে শেখার আগের যুগকে বলে **প্রাগৈতিহাসিক যুগ**। লেখা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পাথরে,

গাছের বাকলে, চামড়ায়, মাটির পাত্রে ও ধাতুর পাতে তার কীর্তি-কাহিনী লিখে গেছে। এইভাবেই শুরু হল ঐতিহাসিক যুগের। এই যুগ সম্পর্কে কিছু কিছু লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে বলেই একে ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়। এই ঐতিহাসিক যুগকেই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে : ১। প্রাচীন ২। মধ্য ৩। আধুনিক।

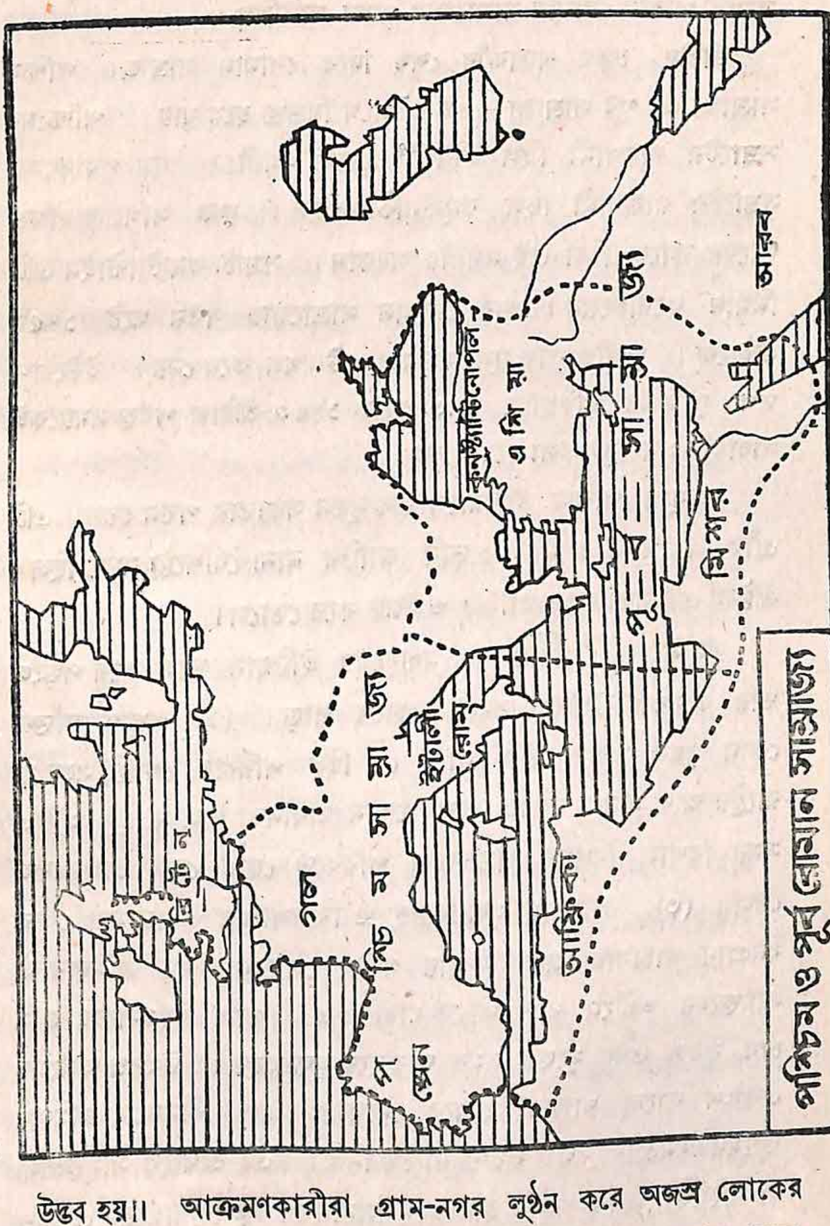
প্রাচীন যুগ : প্রাচীন যুগে পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া, সুমের, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া ও পারস্য, উত্তর-আফ্রিকার মিশর ও কার্থেজ, পূর্ব-এশিয়ার ভারতবর্ষ ও চীন, ইউরোপের ক্রীট, গ্রীস ও রোম এবং আমেরিকার কিছু অংশ অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠে। এ-সকল দেশে সাধারণতঃ রাজা বা সম্রাট শাসনকার্য চালাতেন।

নানা কারণে প্রাচীন যুগের সভ্য দেশগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজাদের দুর্বলতা, গরীব প্রজাদের ওপর তাঁদের নিষ্ঠুর অত্যাচার, ক্রীতদাসের ওপর বেশী নির্ভরতা, যাযাবর জাতিগুলির আক্রমণ প্রভৃতি কারণে প্রাচীন যুগের সভ্যতাগুলি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলেই শুরু হয় নূতন যুগ—যাকে আমরা মধ্যযুগ বলে থাকি। আর এই মধ্যযুগের অবসানেই আধুনিক যুগের শুরু। এখন এই আধুনিক যুগই চলছে।

মধ্য যুগ : মধ্যযুগ বলতে কি বুঝি, সেটা আগে বলে নেওয়া দরকার। কারণ আজ এই মধ্যযুগের কথাই তোমাদের বলব। ছোট্ট করে বলি, প্রাচীন যুগের অবসান থেকে আধুনিক যুগের শুরু পর্যন্ত সময়টাই মধ্যযুগ। সন, তারিখ দিয়ে বলতে গেলে, খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আন্দাজ পাঁচশো বছর পর থেকে প্রায় পনেরশ' বছর পর্যন্ত সময়টা ছিল মধ্যযুগ। একটু ঘুরিয়ে বলি, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক (বা শতাব্দী) পর্যন্ত কালটি মানুষের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে যাযাবর জাতিগুলি বহু সভ্যদেশে হানা দিতে থাকে। এর ফলে বেশ কিছু সভ্যতার পতন ঘটে। এই সময় অভ্যন্তরীণ নানা দুর্বলতা ও বিদেশী জাতির আক্রমণের ফলে রোমান

সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের পতন ঘটেছিল। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেখানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের



উদ্ভব হয়। আক্রমণকারীরা গ্রাম-নগর লুণ্ঠন করে অজস্র লোকের মৃত্যু ঘটায় এবং পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা চুরমার করে দেয়। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ছিলেন রোমিউলাস।

তাঁর জার্মান জাতীয় সেনাপতি ওডোয়াসার বা ওড্রোভাকার তাঁকে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পদচ্যুত করেন। প্রধানতঃ এই জার্মান জাতির আক্রমণের ফলেই পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিম সাম্রাজ্য ও পূর্ব সাম্রাজ্য—এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিমের সম্রাটের রাজধানী ছিল ইটালীর রোম নগরীতে আর পূর্বাঞ্চলের সম্রাটের রাজধানী ছিল কন্‌স্ট্যান্টিনোপলে। কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ তীরের কাছে ছিল এই নগরীর অবস্থান। সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন এটি নির্মাণ করেছিলেন। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তুর্কীজাতীয় মুসলমানেরা এটি দখল করে নেয়। ইউরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে ৪৭৬ থেকে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কেই সাধারণতঃ মধ্যযুগ বলা হয়ে থাকে।

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে এক নূতন সভ্যতার পত্তন হয়। এটি গ্রীক, রোমান, জার্মান প্রভৃতি জাতির নানা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টধর্ম এই সভ্যতাকে মার্জিত ও উন্নত করে তোলে।

মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য ঃ মধ্যযুগের ইতিহাস ভাল করে পড়লে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। (১) এযুগে ব্যক্তির কোন পৃথক মর্যাদা ছিল না। সে ছিল পরিবার, গোষ্ঠি, সঙ্ঘ বা রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। তার বিশেষ কোন স্বাধীনতা ছিল না। (২) এ সময় বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যের পরিবর্তে ছোট ছোট রাজ্য দেখা গেল। (৩) অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদেশীদের আক্রমণ থেকে ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্য অসহায় গরীব লোকেরা বড় জমিদার বা সামন্তদের অধীনে বাস করতে বাধ্য হত। তারা জমিদারের জমি চাষ করত এবং যুদ্ধের সময় তার হয়ে যুদ্ধ করত। উৎপন্ন ফসলের একাংশ তাকে খাজনা হিসাবে দিতে হত। বিনিময়ে জমিদার তাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করার দায়িত্ব নিত। এই প্রথাকে সামন্তপ্রথা বা ফিউড্যালিজম্ বলা হয়। মুসলমানগণ ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য স্থাপন করায় পশ্চিম ইউরোপের বাসিন্দাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায়

বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বণিকরাও এবার জমির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। এর ফলেও এ অঞ্চলে সামন্ত ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। (৪) মধ্যযুগের লোকেরা বেশ মজার মানুষ ছিল। তারা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসত। রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও এটা তারা মোটেই বিশ্বাস করত না। তাদের ধারণা, তারা আগের মতই রোমান সাম্রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ আছে। এই ঐক্যের প্রতীক হল, রোমান সাম্রাজ্যের আদর্শ এবং খ্রীষ্টান ধর্ম বা খ্রীষ্টান গীর্জা। (৫) মধ্যযুগে ধর্মকে জীবনের সারবস্তু বলে মনে করা হত। বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের বাসিন্দাদের ওপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশী। এর প্রভাবে তারা পৃথিবীর সুখ-শান্তির চেয়ে পরলোকের সুখ-শান্তির ওপরেই বেশী গুরুত্ব দিত। তাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত ও কুসংস্কারগ্রস্ত।

এ অবস্থাটা কিন্তু বেশীদিন চলেনি। মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময় থেকেই তার চেহারাটা পাল্টে যেতে থাকে। রাজা-মহারাজারা রোমান সাম্রাজ্যেকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা ত্যাগ করলেন। কারণ তখন এ কাজ করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। তখন এক একটি জাতি এক একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে উদ্যোগী হল।

ভূমধ্যসাগর থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার পর আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে তৈরী হল নূতন নূতন শহর। শহরের ধনী অধিবাসীরা উন্নত ও স্বাধীন জীবন যাপন করতে লাগল। ধীরে ধীরে সমাজের কাঠামোটাই পাল্টে গেল। এবার ব্যক্তি তার মর্যদা ফিরে পেল। এখন থেকে ব্যক্তিই হল সমাজের ভিত্তি, পরিবার নয়।

এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে দেশে প্রচুর অর্থ আমদানি হয়। ফলে জিনিস পত্রের দাম বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু জমিদার বা সামন্তগণ রাতারাতি খাজনা বাড়াতে পারল না। এর ফলে তারা দিন দিন গরীব ও দুর্বল হয়ে পড়ল। শহুরে লোকদের মত বিলাসী জীবন যাপনের জন্য তারা জায়গা জমি বিক্রী করে দিতে থাকে, নগদ টাকার বদলে অধীনস্থ চাষী বা সার্ফদের মুক্তি দেয়, কেউ কেউ

ব্যবসার দিকেও ঝুঁকে পড়ে। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলেও তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই ভাবেই সামন্ত ব্যবস্থা দ্রুত পতনের দিকে এগিয়ে চলল। অন্যদিকে বড় বড় বণিকেরা কলকারখানা স্থাপন করে নানা জিনিস তৈরী করতে থাকে। এদের নূতন নাম হয় পুঁজিপতি বা ক্যাপিট্যালিস্ট। তাদের কারখানায় গরীব লোকেরা মজুরীর বিনিময়ে কাজ করতে থাকে। এদের নাম শ্রমিক বা লেবার। মালিক-গণ এদের খুব কম মজুরী দিয়ে নিজেরা প্রচুর লাভ করতে থাকে। এভাবে সামন্ত-ব্যবস্থার বদলে দেখা দিল পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম।

বাণিজ্য ও যুদ্ধের প্রয়োজনে পশ্চিম ইউরোপীয়রা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ও এশিয়ার মুসলমান দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। এর ফলে তাদের সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত হয়। তুর্কীদের হাতে কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতন ঘটলে সেখানকার পণ্ডিতগণ দলে দলে পশ্চিম ইউরোপের ইটালীতে পালিয়ে আসেন। তাঁদর কাছ থেকে ইউরোপীয়গণ গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যা শেখার সুযোগ পায়। সেই নূতন বিদ্যা পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষকেই গুরুত্ব দিত, পরলোক নিয়ে মাথা ঘামাত না। এই নূতন বিদ্যার প্রভাবে ইউরোপীয়গণ পৃথিবী ও মানুষকে প্রাণভরে ভালবাসতে শিখল। তারা চাইল স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, গোঁড়ামি ত্যাগ করতে এবং অচেনা ও অজানাকে চিনতে ও জানতে। এভাবেই শুরু হল তার বুদ্ধির নবজাগরণ। সমাজে ও রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে ও বিদ্যাচর্চায় এই যে ব্যাপক পরিবর্তন তা-ই মধ্যযুগের মৃত্যু-ঘন্টা বাজায় এবং আধুনিক যুগের সূচনা করে।

এতক্ষণ আমরা প্রধানতঃ পশ্চিম ইউরোপের কথাই বলেছি। পৃথিবীর আর একটি সুসভ্য দেশ ভারতে মধ্যযুগের সূচনা হয় গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে। পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর-পশ্চিম চীন থেকে আসা হুন নামে এক দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতির আক্রমণে এই বিশাল সাম্রাজ্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ শতকে এটি একেবারে ভেঙ্গে যায়।

তখন ভারতে দেখা দেয় অনেক ছোট ছোট রাজ্য। মধ্যযুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সামন্ত-ব্যবস্থা অবশ্য পঞ্চম শতকেই ভারতে দেখা গিয়েছিল। নানা অভ্যন্তরীণ কারণে এবং বৈদেশিক আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ায় সামন্তগণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে জমির ওপরেই রাজা-প্রজাকে নির্ভর করতে হয়। সামন্ত-ব্যবস্থা প্রসারের এটি একটি প্রধান কারণ। আমরা জানি পশ্চিম ইউরোপেরও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা সময়ে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল। সকল দেশের মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলিও এক ধরনের ছিল না। এর কারণ হল, বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি আলাদা রকমের এবং মানুষের অগ্রগতিও সর্বত্র একরকমের নয়। তবে বহু দেশে সাধারণতঃ পঞ্চম শতকেই সামন্ত-ব্যবস্থার সাক্ষাৎ মেলে। আগেই বলেছি, এটি মধ্যযুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাসের যুগবিভাগ : এতক্ষণ আমরা ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ইতিহাসকে এভাবে ভাগ করা ঠিক নয়। ইতিহাস ঠিক জলস্রোতের মত—অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে। এতে কোন দাগ কাটা যায় না। ইতিহাসে হঠাৎ করে কোন যুগ শেষ হয়ে যায় না বা হুম্ করে কোন যুগ শুরুও হয় না। এক যুগ ধীরে ধীরে অন্য যুগের সঙ্গে মিশে যায়। তাই দেখি, মধ্যযুগে প্রাচীন যুগের অনেক বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী যুগ পূর্ব-যুগেরই সন্তান। পিতা-পুত্রে যে মিল অনেক, সেটা কে না জানে? তবু আমরা ইতিহাসকে নানা যুগে ভাগ করি কেন? করি, কারণ এতে ইতিহাস পড়া অনেক সহজ হয়। প্রতি যুগেরই কয়েকটি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকে। এগুলি বিচার করেই যুগগুলির নামকরণ করা হয়ে থাকে।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ	—৪৬৬	পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন
	—৪৭৬—১৪৫৩	মধ্যযুগ
	—পঞ্চম—ষষ্ঠ শতক	গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন
	—১৪৫৩	কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতন

সারসংক্ষেপ ● পাঠের সুবিধার জন্য মানুষের ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এটি অবশ্য বিজ্ঞান-সম্মত নয়। ৪৭৬ থেকে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় "মধ্যযুগ" বলে পরিচিত। মধ্যযুগে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল না। এই যুগেই সামন্তপ্রথার উত্থান ও পতন ঘটে। এই যুগের শেষ দিকে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগের মানুষ ধর্মকে খুবই গুরুত্ব দিত। তারা ছিল নানা কুসংস্কারগ্রস্ত। তবে শীঘ্রই গ্রীকবিদ্যা চর্চার ফলে তারা উন্নত হয়ে ওঠে।

মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য দেখা যেত। সব দেশের মধ্যযুগ এক ধরনের ছিল না।

অনুশীলনী

১। "মধ্যযুগ" বলতে কি বোঝ? ২। পশ্চিমাঞ্চলের রোমান সাম্রাজ্যের পতন কখন ঘটে? ৩। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাটের নাম কি? ৪। মধ্যযুগের যে কোন তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। ৫। সকল দেশের মধ্যযুগ একরকম হয়নি কেন?

৬। এককথায় উত্তর দাও:—

(ক) সামন্ত-ব্যবস্থা কোন্ যুগের বৈশিষ্ট্য? (খ) কন্‌স্ট্যান্টিনোপলকে প্রতিষ্ঠা করেন? (গ) কন্‌স্ট্যান্টিনোপল-এর পতন কবে হয়? কাদের হাতে এর পতন ঘটে? (ঘ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন কবে হয়? (ঙ) হুনরা কোথায় বাস করত? (চ) কাদের আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে? (ছ) পুঁজিবাদকে ইংরেজীতে কি বলা হয়? (জ) পৃথিবীর বহু দেশে সামন্ত ব্যবস্থা কখন দেখা দিয়েছিল?

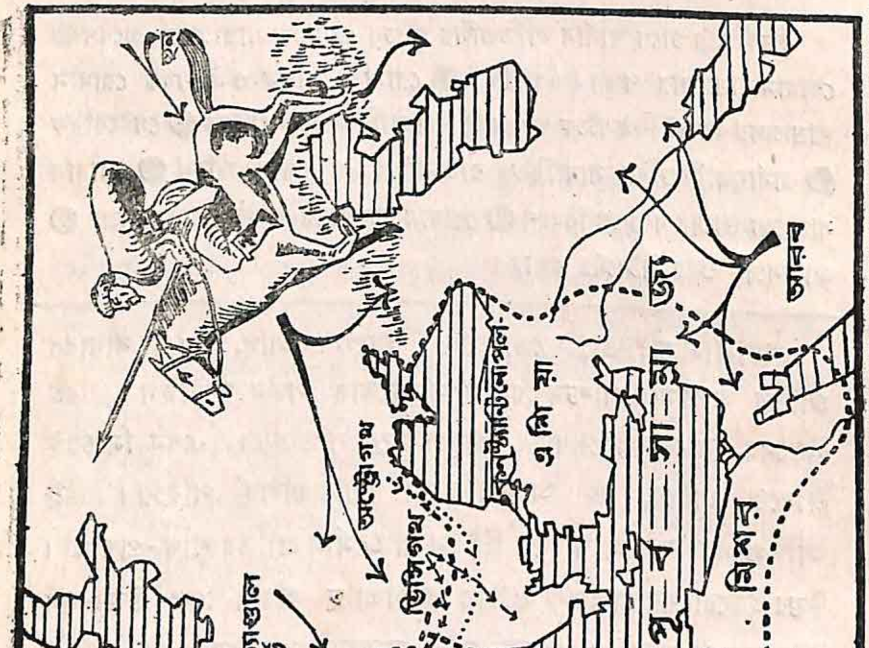
পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ

হুনজাতির চাপে জার্মান জাতিগুলির পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের প্রবেশ ● রোমান সাম্রাজ্যের পতন (৪৭৬খ্রীঃ) ● রোমান আইন ও ঐক্যবদ্ধ রোমান সাম্রাজ্যের আদর্শ কিন্তু টিকে থাকল ● অ্যালারিক ● অ্যাটিলা ● গেইসেরিক ● জার্মানজাতিগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন ● রোমান সাম্রাজ্যে তাদের বসতির বিবরণ ● রোমান জনগণের সহিত তাদের মিশ্রণ ● জার্মানদের ওপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব।

জার্মান জাতি ঃ তোমাদের আগে বলেছি, নানা যাযাবর জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। এই পতনের পর থেকেই সেখানে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়। এখন নিশ্চয়ই জানতে চাইবে, এই আক্রমণকারী জাতিগুলির পরিচয়। এই জাতিগুলির অধিকাংশ ছিল টিউটন বা জার্মান জাতির শাখা-প্রশাখা। উত্তর ইউরোপের ডেনমার্ক ও তার কাছাকাছি অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব ইউরোপের এলব্ ও ওডার নদীর মাঝামাঝি স্থানে তারা বসবাস করত। বহুদিন ধরেই নানা কারণে এরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তারা পূর্বদিকে দানিয়ুব ও পশ্চিম দিকে রাইন নদী পার হয়ে কখনও শান্তিপূর্ণভাবে, কখনও বা জোর করে রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে থাকে। যুদ্ধবন্দী বা ক্রীতদাস হিসাবেও অনেকে রোমান সাম্রাজ্যে বাস করতে বাধ্য হয়। অনেকে স্বেচ্ছায় রোমান সৈন্যদলেও যোগ দেয়। রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী জার্মানরা প্রায়ই রোমানদের হয়ে যুদ্ধবিগ্রহ করত। নিজেদের দেশে মানুষ ও পশুর খাদ্যের অভাব ঘটায় বা জলবায়ুর পরিবর্তন হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে তারা উষ্ণ, শস্যশ্যামল ও সুশাসিত রোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

জার্মান জাতিগুলির মধ্যে ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, অস্ট্রোগথ (পূর্বাঞ্চলের গথ), ভিসিগথ (পশ্চিমাঞ্চলের গথ), অ্যালেম্যান, লম্বার্ড, স্যাক্সন,

অ্যাঙ্গল, জুট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গ্রীক ও রোমানগণ এদের বর্বর জাতি বলে বর্ণনা করেছে। কারণ তারা গ্রীক ও রোমানদের মত



সুসভ্য ছিল না। গ্রীক ও রোমানগণ প্রথম দিকে তাদের ভাষা ভাল করে বুঝত না; জার্মানদের আচার-আচরণও গ্রীক ও

রোমানদের কাছে উদ্ভট বলে মনে হত। একই কারণে সুসভ্য ভারতীয়গণ বিদেশী আক্রমণকারীদের ম্লেচ্ছ বলেছে।

হুন আক্রমণ ও তার ফলাফলঃ প্রথম দিকে জার্মান জাতিগুলি মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করছিল। কিন্তু চতুর্থ শতকে এশিয়া থেকে এক দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি পূর্ব ইউরোপে এসে হানা দেয়। এই জাতির নাম হুন। হুনগণ চীনদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করত। এরা দেখতে ছোট-খাট ; এদের গায়ের রঙ হলদে, নাক ছড়ান, চোখ খুদে-খুদে, এরা ঘোড়ায় চড়তে খুব ওস্তাদ। তাদের পোশাক-আশাক খুবই নোংরা এবং গায়ে খুব দুর্গন্ধ। হুনরা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসেই ছিল তাদের পরম আনন্দ। সব মিলিয়ে জার্মান ও রোমানদের চোখে হুনরা ছিল বীভৎস। রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল অংশ এদের করায়ত্ত হয়েছিল।

খাদ্যের অভাবে, চীনা সম্রাটদের চাপে বা অন্য কোন কারণে হুনরা মধ্য এশিয়া থেকে পূর্ব ইউরোপে হানা দেয়। হুনদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় আতঙ্কিত হয়ে অস্ট্রোগথ, ভিসিগথ প্রভৃতি জার্মান জাতি প্রথমে পূর্ব রোমান ও পরে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়ে। দুর্বল রোমান-সম্রাটের সাধ্য ছিল না লক্ষ লক্ষ লোককে বাধা দেওয়া। জার্মানগণ তাদের পরিবার-পরিজন ও মাল-পত্র নিয়ে রোমান সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়ে। রোমানদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে তারা বসবাস করতে থাকে। নামে রোমান সম্রাটের অধীন হলেও তারা নিজেদের দলপতিদের নেতৃত্বে স্বাধীন ভাবেই জীবনযাপন করত। চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত কালকে জার্মান জাতির মাইগ্রেশন বা দেশান্তর গমনের যুগ বলা হয়।

জার্মানদের আগমনের ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময় পশ্চিমাঞ্চলের রোমান সম্রাট জার্মান সৈন্য ও সেনাপতিদের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। এই অবস্থায় ভ্যাণ্ডাল জাতির নেতা ওডোয়াসার নাবালক সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টুলাসকে বিতারিত করে নিজেই প্রকৃত ক্ষমতা হস্তগত

করেন (৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এইভাবে পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হল। আগে যেখানে ছিল এক বিশাল ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য সেখানে এখন দেখা দিল বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য।

লুপ্ত সাম্রাজ্যের চিহ্ন : পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটলেও সেই সাম্রাজ্যের সব চিহ্ন কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় নি। জার্মানগণ রোমান সাম্রাজ্যের বহু গ্রাম-নগর শিল্পসামগ্রী ও শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস করলেও রোমান আইনের প্রতি তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তারা নিজেদের ব্যাপারে অবশ্য জার্মান প্রথা বা আইনই মেনে চলত ; কিন্তু রোমানদের বেলায় রোমান আইন অনুযায়ীই তাদের বিচার করা হত। সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে গেলেও ঐক্যবদ্ধ রোমান সাম্রাজ্যের কথা রোমানগণ কখনও ভুলে যায় নি। এমন কি বর্বর জার্মানগণও রোমান সাম্রাজ্যের আদর্শ সযত্নে মনে পুষে রেখেছিল। পরবর্তীকালে অনেক জার্মান রাজা রোমান সাম্রাজ্যকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য বারবার চেষ্টা করছিলেন।

কয়েকজন বর্বর নেতা : বর্বর জাতিগুলি তাদের দলপতিদের নেতৃত্বে দূর দেশ থেকে রোমান সাম্রাজ্যে চলে আসে। এই সকল নেতারা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধিমান ও যুদ্ধনিপুণ। এঁদের কয়েকজনের কথা এখন তোমাদের বলব।

অ্যালারিক : ভিসিগথদের রাজা ছিলেন অ্যালারিক। তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। অ্যালারিক প্রথম জীবনে পূর্ব সম্রাটের অধীনে কাজ করেন। পরে সম্রাটের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি গ্রীসের কয়েকটি নগর লুণ্ঠন করেছিলেন। এর পর অ্যালারিক পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এ অঞ্চলের সম্রাট হনোরিয়াসের ভ্যাণ্ডাল জাতীয় সেনাপতি স্টিলিচো তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। স্টিলিচো-র মৃত্যুর পর অ্যালারিক ইটালী আক্রমণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত রোম নগরী অবরোধ করে বসেন। বহু মূল্যবান উপহার আদায় করার পর তিনি অবরোধ তুলে নেন। অতঃপর অ্যালারিক ভিসিগথ-দের বসবাসের জন্য ইটালীতে উপযুক্ত জমি দাবী করেন। হরোনিয়াস

এতে কান না দেওয়ায় অ্যালারিক ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রোম দখল করে নেন। তাঁর সৈন্যেরা রোমানদের ধন-সম্পত্তি নিঃশেষে লুঠ করে, বহু অট্টালিকা ও শিল্পবস্তু ধ্বংস করে এবং নগরীর পথে পথে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। অ্যালারিক রোমান গীর্জাগুলি অবশ্য ধ্বংস করেননি। এইভাবে রোমান সাম্রাজ্যের বিখ্যাত রাজধানী আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও মর্যাদাচ্যুত হল। রোমের এই পতনে পশ্চিম ইউরোপের সভ্য জনগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হ'য়ে পড়েছিল। এরপর অ্যালারিক রোমান সাম্রাজ্যের 'শস্য ভাণ্ডার' উত্তর আফ্রিকা আক্রমণের উদ্যোগ করেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি।

অ্যাটিলা ঃ দুর্ধর্ষ হুন জাতির শেষ রাজা ছিলেন অ্যাটিলা। তাঁর জন্মের আগে থেকেই হুনরা পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরীতে বসতি স্থাপন করেছিল। শীঘ্রই পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের এক বিশাল অংশে তাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। পূর্বে মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিমে ইউরোপের রাইন নদী পর্যন্ত অ্যাটিলার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

অ্যাটিলা বিভিন্ন হুন জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। পরাজিত জার্মানগণকে তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীতে নিয়ে নেন। তিনি ছিলেন দক্ষ সেনাপতি, দুঃসাহসী যোদ্ধা, ধূর্ত কূটনীতিবিদ ও প্রতিভাবান নেতা। নিষ্ঠুরতার জন্যই তিনি কুখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর মত ধ্বংসকারী পৃথিবীতে নাকি আর জন্মায়নি। তিনি শত শত নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন এবং অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটান। তিনি গর্ব করে বলতেন, "আমি যে পথ দিয়ে যাব, সেখানে আর কোনদিন দূর্বা গজাবে না।" তাঁকে বলা হত মানবজাতির শত্রু, বিধাতার হাতের চাবুক। ঈশ্বর বোধ হয় অ্যাটিলার হাত দিয়ে নানা পাপে পাপী মানবজাতিকে চরম শাস্তি দিয়েছিলেন।

অ্যাটিলা পূর্ব রোমান সম্রাটকে কর দিতে বাধ্য করেন। তিনি পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে পশ্চিম সাম্রাজ্যের গল দেশ (বর্তমান ফ্রান্স) আক্রমণ করেন। রোমান সেনাপতি ঈটিয়াস গথ প্রভৃতি জার্মান জাতির সাহায্যে অ্যাটিলাকে পরাজিত করতে সমর্থ হন (৪৫১ খ্রীঃ)।

পরের বছরেই অ্যাটিলা ইটালী আক্রমণ করেন। পোপ প্রথম লিও অ্যাটিলার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে চলে যেতে বলেন। সে যুগের বর্বর জাতিগুলি পোপের ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করত। হয়ত পোপের অভিশাপের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে অ্যাটিলা রোম আক্রমণ না করেই চলে যান। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

গেইসেরিক ঃ গেইসেরিক বা জেনসেরিক ছিলেন ভ্যাণ্ডালদের রাজা। তিনি ছিলেন দেখতে ছোটখাট এবং খোঁড়া। গেইসেরিক অত্যন্ত লোভী ও নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁর সময় ভ্যাণ্ডালগণ বর্তমান স্পেন দেশে বাস করছিল। এ সময় ভিসিগথগণ ভ্যাণ্ডালদের দেশে ঢুকে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তখন ভ্যাণ্ডালনেতা গেইসেরিক ভ্যাণ্ডালদের নিয়ে জিব্রালটার প্রণালী পেরিয়ে উত্তর আফ্রিকায় চলে যান। সেখানে কার্থেজ নগরীতে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। আফ্রিকার পরাজিত লোকদের ওপর গেইসেরিকের দলবল নির্মম অত্যাচার চালায়। শীঘ্রই গেইসেরিক একটি সুদক্ষ নৌবহর গড়ে তোলেন। এর সাহায্যে তিনি ভূমধ্যসাগরের বেশ কয়েকটি দ্বীপ দখল করে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম আক্রমণ করেন। রোম সহজেই তাঁর হাতে আসে। পোপ প্রথম লিও-র আবেদনে খ্রীষ্টান গেইসেরিক রোমানদের প্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর সৈন্যেরা দুই সপ্তাহ ধরে রোমের সব মূল্যবান জিনিস লুঠ করে। তাদের হাতে



বর্বর জার্মান

রোমের বহু অট্টালিকা, প্রাসাদ ও শিল্পসামগ্রী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়; গেইসেরিক ত্রিশ হাজার রোমানকে দাস হিসাবে ধরে নিয়ে

গিয়েছিলেন। তিনি রোমান সম্রাটের বিধবা পত্নী ও কন্যাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। ভ্যাণ্ডালদের ধ্বংসলীলা দেখে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় একটি কথার সৃষ্টি হয়, তার নাম 'ভ্যাণ্ডালিজম'। এর অর্থ হল নির্বোধের মত অকারণে সুন্দর ও মূল্যবান জিনিস নষ্ট করা। ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গেইসেরিকের মৃত্যু হয়।

এতক্ষণ ধরে জার্মান জাতিগুলির রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণের কথা বললাম। এবার এসো, সামাজিক রাজনৈতিক, ও ধর্মজীবন সম্পর্কে দু'চার কথা বলি। যারা এত বড় রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটাল, তাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় জানার ইচ্ছা খুবই স্বাভাবিক, নয় কি? জার্মানগণ ছিল লম্বা-চওড়া ও শক্ত সমর্থ চেহারার মানুষ। তাদের চোখ গভীর নীল, চুল লালচে এবং রঙ খুব ফর্সা।

সমাজ জীবন ঃ রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সীজার খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে তাঁর 'কমেণ্টারিস' নামক পুস্তকে এবং রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) তাঁর 'জার্মানিয়া' গ্রন্থে জার্মান জাতিগুলি সম্পর্কে অনেক কথা লিখে গেছেন। জুলিয়াস সীজারের মতে, জার্মানগণ ছিল এক পশুপালক, যুদ্ধপ্রিয়, যাযাবর জাতি। তারা চাষবাস তেমন পছন্দ করত না। জার্মানগণ হরিণের চামড়ার পোশাক পরত। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল দুধ, পনীর ও মাংস। তারা ছিল সং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অতিথিপরায়ণ। জার্মান গোষ্ঠীগুলিকে একখণ্ড করে জমি দেওয়া হত। ব্যক্তির কোন ভূ-সম্পত্তি থাকত না।

ট্যাসিটাস বলে গেছেন জার্মানগণ বনাঞ্চলে কাঠ, মাটি ও খড় দিয়ে তৈরী খোলা-মেলা কুঁড়ে ঘরে বাস করত। তাদের কুঁড়ের চারধারে অনেকটা ফাঁকা জমি থাকত। দূরে দূরে অবস্থিত কিছু কুঁড়ে নিয়ে গড়ে উঠত তাদের গ্রাম। তারা ঘিঞ্জি নগরে বাস করত না। পশুই ছিল জার্মানদের প্রধান সম্পদ। পশুর চামড়া বা কাপড়ের তৈরী ঢিলে আলখাল্লা ছিল তাদের পোশাক। ধীরে ধীরে তারা চাষবাস করতে শেখে। দুধ, পনীর এবং গম ও যবের পিঠে ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। তারা অত্যধিক মদ্যপান করতেও অভ্যস্ত ছিল।

জার্মান সমাজে মেয়েদের খুব সম্মান ছিল। বিপদে-আপদে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হত। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে স্বামী-পুত্রদের উৎসাহ দিত। পুরুষরা সাধারণতঃ একবারই বিয়ে করত। স্ত্রী ও ক্রীতদাসগণই চাষবাস এবং সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করত। পুরুষেরা শিকার, মারামারি, যুদ্ধ ও আমোদ-প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এসব করার সময় পেত না। নানা বিপজ্জনক খেলা, জুয়া প্রভৃতির তারা ভক্ত ছিল। তারা তলোয়ার, বর্শা, ঢাল প্রভৃতির ব্যবহার জানত। লাঙল দিয়ে জমি চাষ এবং ঘোড়া দিয়ে গাড়ী টানার কৌশল তারা ভালভাবেই আয়ত্ব করে। রোমানদের সংস্পর্শে এসে জার্মানগণ টাকার ব্যবহার ও ব্যবসা-বাণিজ্য শেখে। অবশ্য এর সঙ্গে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থাও চালু ছিল। অর্থাৎ একটি জিনিসের বদলে অন্য জিনিস নেওয়া হত।

জার্মান সমাজে তিন শ্রেণীর লোক ছিল—(১) অভিজাত, (২) স্বাধীন প্রজা, (৩) দাসদাসী। অভিজাতদের বেশী জমি থাকত। দাসগণ এগুলি চাষ করত। স্বাধীন প্রজারা নিজেদের জমি নিজেরাই চষত। সমাজে পরিবার বা গোষ্ঠী বা দলের কর্তার খুব সম্মান ছিল। তাঁর কথা সকলেই মেনে চলত। তাঁর সঙ্গে থাকত একদল অনুচর। এরা তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ বিগ্রহ করত বা লুঠপাটে অংশ নিত। পরে এদেরই নাম হয় সামন্ত। দলপতি এদের খাওয়া-দাওয়া ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাবার ভার নিতেন। জার্মানগণ ছিল অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয় ও দুঃসাহসী। তারা সহজ সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিল। তাদের চাহিদা বেশী না থাকায় তারা বেশ সুখীই ছিল।

রাজনৈতিক জীবন ঃ জার্মানরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। প্রথমদিকে যুদ্ধের সময় তারা একজন যোগ্য ব্যক্তিকে দলপতি হিসাবে বেছে নিত। পরে শান্তির সময়েও দলপতি নির্বাচিত হত। কালক্রমে দলপতির ক্ষমতা বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত যোগ্যতম দলপতিকে রাজপদে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হয়। শীঘ্রই দলপতি বংশানুক্রমিক ভাবে নির্বাচিত হতে থাকেন। অর্থাৎ দলপতির মৃত্যুর

পর তাঁর পুত্র দলপতির পদ লাভ করতেন। রাজার ক্ষমতা সীমাহীন ছিল না। তাঁকে নানা প্রথা বা আইন মেনে চলতে হত। স্বাধীনতা-প্রিয় ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রজাদের ওপর অত্যাচার করা সহজ ছিল না। শাসনের সুবিধার জন্য দেশকে গ্রাম, হাণ্ড্রেড এবং ক্যান্টনে ভাগ করা হত। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে হাণ্ড্রেড এবং কয়েকটি হাণ্ড্রেড নিয়ে ক্যান্টন এবং কয়েকটি ক্যান্টন নিয়ে জাতি বা রাষ্ট্র গঠিত হত। প্রতিটি গ্রাম, হাণ্ড্রেড ও ক্যান্টনে একটি করে সভা থাকত। দলপতিদের নেতৃত্বে এই সভাগুলি নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিত ও বিচার-আচার করত। সবার উপরে ছিল জাতীয়সভা। সভার কোন প্রস্তাবে স্বাধীন প্রজারা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানির সাহায্যে তাদের সম্মতি জানাত। আর তারা তাদের অসম্মতি জানাত চীৎকার করে।

কোন গোষ্ঠীর কোন লোক অন্য গোষ্ঠীর কোন লোকের ক্ষতি করলে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে শত্রুতা চলত। পরে অবশ্য ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তির ক্ষতি করা হত তাকে বা তার পরিবারকে কয়েকটি পশু বা কিছু অর্থ দিলেই মিটে যেত।

ধর্ম ঃ জার্মানগণ প্রকৃতির নানা শক্তি যেমন, বজ্র-বিদ্যুৎ, আকাশ প্রভৃতির উপাসনা করত। তারা বহু দেবদেবীর উপাসক ছিল। টিউ, ওডেন, থর, ফ্রায়া প্রভৃতি ছিলেন তাদের প্রধান দেবদেবী। এঁদের নাম থেকে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের ইংরেজী নাম তৈরী হয়েছে। কতকগুলি ঝোপ-ঝাড়কে জার্মানগণ পবিত্র স্থান বলে মনে করত। তারা ছিল নানা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। পাখীর ওড়া দেখে বা সাদা ঘোড়ার ডাক শুনে তাদের পুরোহিতরা দেবদেবী সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট তা জেনে নিত। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় জার্মানদের গ্রামগুলিতে নানা ধর্মীয় উৎসব হত। দেবতাদের কাছে নরবলি ও পশুবলি দেবার রীতি ছিল। সংক্ষেপে জার্মানদের ধর্ম-বিশ্বাস ছিল বেশ সহজ ও সরল। পরবর্তী কালে জার্মানগণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

রোমান সাম্রাজ্যে জার্মানদের বসতি ঃ বিভিন্ন জার্মান জাতি রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল।

এদের বাসস্থান সম্পর্কে দু-এক কথা বলে নিই। ফ্রাঙ্কগণ গল বা বর্তমান ফ্রান্সে, অষ্ট্রোগথগণ অস্ট্রিয়া ও ইটালীতে, ভ্যাণ্ডালগণ প্রথমে স্পেন ও পরে উত্তর আফ্রিকাতে এবং ভিসিগথরা দক্ষিণ গল ও স্পেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। বার্গাণ্ডিয়ানগণ রোণ নদীর উপত্যকায়, অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ও জুটগণ ব্রিটেনে, লম্বার্ডগণ ইটালীতে এবং অ্যালেম্যানরা দানিয়ুব নদীর দক্ষিণ তীরে বসতি স্থাপন করে।

এই সকল জার্মান জাতি রোমানগণের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। সজীব ও সতেজ জার্মান এবং সভ্য অথচ দুর্বল রোমানগণ মিলে যে মিশ্র সভ্যতার সৃষ্টি করে তাকেই ইউরোপের মধ্যযুগীয় সভ্যতা বলা হয়।

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ঃ জার্মানজাতিগুলির মধ্যে গথগণ সবার আগে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। উলফিলা নামে এক খ্রীষ্টান পুরোহিত (বিশপ) তাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। অবশ্য এরও অনেক আগে থেকে নানা জাতির জার্মানগণ রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানে বসবাস ও কাজকর্ম করছিল। তারাও খুব সম্ভব খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শে এসেছিল। গথ, ভ্যাণ্ডাল, লম্বার্ড প্রভৃতি জাতিগুলি খ্রীষ্টান-ধর্মের অ্যারিয়ান মতে দীক্ষিত হয়েছিল। এই মত অনুযায়ী, যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের সন্তান হলেও তিনি ঈশ্বর থেকে ভিন্ন এবং নিম্ন স্তরের। ফ্রাঙ্কগণ অবশ্য গোঁড়া খ্রীষ্টান ধর্মেই দীক্ষিত হয়। এই মতে ঈশ্বর ও যীশু সমস্তরের এবং অভিন্ন। অ্যারিয়ান ও গোঁড়া ধর্মে দীক্ষিত খ্রীষ্টান-দের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে জার্মানগণ কিছু পরিমাণে শান্ত, সভ্য ও মার্জিত হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবেই জার্মানগণ পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। খ্রীষ্টান জার্মানগণ পরবর্তীকালে খ্রীষ্টধর্মের প্রধান প্রচারক ও রক্ষক হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলেই রোমানদের সঙ্গে তাদের মিলন অনেক সহজ হয়েছিল।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টান	—চতুর্থ শতক	হুন আক্রমণ
	—৪১০	অ্যালারিক কর্তৃক রোম দখল
	—৪৫১	অ্যাটিলার পরাজয়
	—৪৫৫	গেইসেরিক কর্তৃক রোম দখল

সারসংক্ষেপ ● খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে যাযাবর হুনদের আক্রমণের ফলে বিভিন্ন জার্মানজাতি পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত তার পতন ঘটায় (৪৭৬ খ্রীঃ)। ঐ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। তবে রোমান সাম্রাজ্যের কিছু কিছু চিহ্ন রয়ে যায়। সুসভ্য রোমানগণ জার্মানদের বর্বর বলত। হুন নেতা অ্যাটিলা, ভিসিগথ নেতা অ্যালারিক ও ভ্যাণ্ডাল নেতা গেইসেরিক পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

জার্মানগণ ছিল দুঃসাহসী, শক্ত-সমর্থ ও স্বাধীনতা-প্রিয়। তারা শিকার, যুদ্ধ প্রভৃতির খুব ভক্ত ছিল। তারা খুবই সাদাসিধে জীবন যাপন করত। সমাজে নারীর যথেষ্ট সম্মান ছিল। জার্মানগণ দলপতির কথা মেনে চলত। তাদের মধ্যে বহু দেবদেবীর পূজার প্রচলন ছিল।

অনুশীলনী

১। জার্মান জাতিগুলি কোথায় বসবাস করত? 'টিউটন' কারা?

২। হুনরা কোন্ দেশ থেকে ইউরোপে আসে? তাদের সম্পর্কে কি জান? হুনদের শেষ রাজার নাম কি?

৩। জার্মানগণ দলে দলে কেন পূর্ব ও পশ্চিম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। এর ফলে কি হয়েছিল? কয়েকজন জার্মান নেতার নাম কর।

৪। কে, কখন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটান? এর ফলে কি হল?

৫। রোমান সাম্রাজ্যের কোন্ কোন্ চিহ্ন নষ্ট হয়নি? এর কারণ লেখ।

৬। টীকা লেখ: (ক) অ্যালারিক (খ) অ্যাটিলা (গ) গেইসেরিক।

৭। জার্মানদের সমাজ জীবন বা রাজনৈতিক জীবন এবং ধর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। জার্মানদের কোন্ গুণটি তোমার ভাল লাগে?

৮। জার্মানগণ পশ্চিম ইউরোপের কোন্ কোন্ স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল ? মিশ্র সভ্যতা কি করে গড়ে উঠল ?

৯। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব জার্মানদের ওপর কতটা পড়েছিল ?

১০। শুদ্ধ উত্তরটির নীচে দাগ (—) দাও :—

(ক) জার্মানগণ কোন্ জাতির চাপে রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে ?—ব্রিটিশ/হুন/আর্য।

(খ) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে—৪৭৬/৬২৫/ ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে।

(গ) ভিসিগথদের নেতা ছিলেন—অ্যাটিলা/গেইসেরিক/অ্যালারিক।

(ঘ) জার্মানগণ বাস করত—গ্রামে/নগরে/মরুভূমিতে।

(ঙ) জার্মানরা পূজা দিত—মন্দিরে/ঝোপে/ঝাড়ে-মসজিদে।

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) এই জাতিগুলির অধিকাংশ ছিল টিউটন বা—জাতির শাখা-প্রশাখা।

(খ) উত্তর আফ্রিকাকে রোমান সাম্রাজ্যের — বলা হয়।

(গ) জার্মানদের রঙ খুব —।

(ঘ) ট্যাসিটাস এর গ্রন্থের নাম —।

(ঙ) 'কমেণ্টারিস' রচনা করেন —।

(চ) জার্মান সমাজে — শ্রেণীর লোক ছিল।

(ছ) কয়েকটি ক্যাণ্টন নিয়ে — গঠিত হত।

(জ) —জার্মানদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন।

১১। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) 'ভিসিগথ' কথাটির অর্থ কি ?

(খ) হুনগণ চীনের কোন্ অংশে বসবাস করত ?

(গ) পশ্চিমাঞ্চলের শেষ রোমান সম্রাট কে ছিলেন ?

(ঘ) ওডোয়াসার কেন বিখ্যাত ?

(ঙ) কাকে বিধাতার হাতের চাবুক বলা হত ?

(চ) কাদের 'চোখ গভীর নীল চুল লালচে এবং রঙ খুব ফর্সা' ছিল ?

(ছ) কিভাবে হাণ্ড্রেড বা ক্যাণ্টন গঠিত হত ?

ইউরোপের তথাকথিত অন্ধকার যুগ

চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না ● মঠগুলি ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ● সভ্যতা বিস্তারে খ্রীষ্টধর্মের ভূমিকা।

মধ্যযুগের কথা তোমাদের আগে কিছু বলেছি। এযুগ সম্পর্কে একটা মজার ব্যাপার জেনে রাখা ভাল। মধ্যযুগের লোকেরা কিন্তু তাদের যুগকে কখনও মধ্যযুগ বলত না। তারা সেটিকে আধুনিক যুগ বলেই ভেবে থাকবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের কিছু লোক নিজেদের হঠাৎ আধুনিক যুগের লোক বলে ভাবতে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুবই উন্নত হয়ে ওঠে তারা। চতুর্থ বা পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়টাকে তারা মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করে। তাদের কাছে মধ্যযুগ বলতে বোঝায় শুধু বর্বরদের আক্রমণ, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার অবক্ষয়। তারা ইউরোপের ইতিহাসের মধ্য যুগকে, বিশেষ করে তার প্রথমাংশকে **অন্ধকারের যুগ** বলেই মনে করত। এই মত অনুযায়ী চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত কালটি ছিল অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে ঢাকা, সভ্যতার আলোক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

প্রথমে মধ্যযুগ সম্পর্কে এই ধারণাটি সঠিক বলেই মনে হয়। কারণ চতুর্থ শতক থেকেই পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বর্বরগণ ব্যাপকভাবে এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে থাকে। শীঘ্রই তারা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল অংশ অধিকার করতে সমর্থ হয়। বর্বর জার্মানগণের আক্রমণে বহু গ্রাম-নগর লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হয়, সুন্দর সুন্দর প্রসাদ, অট্টালিকা, মূর্তি প্রভৃতি ধ্বংস হয়, রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ে এবং রোমান সাম্রাজ্যের বদলে অনেকগুলি ছোট ছোট বর্বর রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এসময় কৃষি ও শিল্পও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আগে সাম্রাজ্যের

সর্বত্র রোমান আইন চালু ছিল। এখন বর্বরদের রাজ্যগুলিতে তাদের নিজস্ব আইন চালু হল। বর্বরদের আক্রমণের ফলে রোমান শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, ধন ও প্রাণের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় এবং বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল আলোর পরিবর্তে দেখা দিল দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি, লুঠতরাজ আর বিশৃঙ্খলা। এককথায় সভ্যতার বদলে শুরু হল বর্বরতা। এ সময় শিল্প ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি বললেই চলে। তাই এ যুগকে "অন্ধকার যুগ" বলা হয়ে থাকে।

একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এই মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। জার্মানগণের আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য একেবারে অন্ধকারে ডুবে যায়নি। জার্মানগণকে বর্বর বলা হলেও তারা একেবারে অসভ্য ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে রোমানদের সংস্পর্শে থাকার ফলে তারা মোটামুটি সভ্য হয়ে উঠেছিল। জায়গা-জমি ও অর্থের লোভে তারা অনেক নিষ্ঠুর কাজ করলেও রোমান সভ্যতার প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তারা পরাজিত রোমানদের রোমান আইন অনুযায়ীই শাসন করত। যোগ্য রোমান কর্মচারীদের দ্বারা শাসন কার্য চালান হত। এই সকল কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ পুরনো বিদ্যালয়গুলি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং বেশ কিছু নূতন বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। রোমান সম্রাটগণ জনগণের ওপর বিরাট করের বোঝা চাপিয়েছিলেন। জার্মান শাসকগণ এই করের বোঝা থেকে রোমানদের অনেকাংশে মুক্ত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। জার্মানদের আক্রমণে হঠাৎ রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেনি। দীর্ঘদিন ধরেই নানা কারণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল জার্মানদের আক্রমণের আগে থেকেই।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও খ্রীষ্টধর্ম বা খ্রীষ্টান গীর্জা মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়েছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারকগণ জার্মান

জাতিগুলিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। এর ফলে জার্মানগণ খ্রীষ্টান গীর্জার সমর্থক ও রক্ষক হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টান পুরোহিত ও সন্ন্যাসীরা রোমান সভ্যতার ধারক ও বাহক ছিলেন। মঠগুলিতে বসবাসকারী সন্ন্যাসীরা সেখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মূল্যবান পুঁথিগুলি নকল করে তারা সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এঁদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার আলো পশ্চিম ইউরোপে জ্বালিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত কোন কোন জার্মান রাজাও বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হলে জার্মানগণ শাসন, চাষাবাস ও বাণিজ্যের উন্নতিতে মন দেয় এবং রোমানদের হতাশার মনোভাবও ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য সগৌরবে দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্ট্যান্টিনোপল ছিল গ্রীক-রোমান-খ্রীষ্টান-সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র।

পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারকগণ আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। বর্বর জাতিগুলিকে এই ধর্মে দীক্ষিত করে তাঁরা তাদের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায় বোধ এবং পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জাগিয়ে তোলেন। অন্যায় কাজ করলে কঠোর শাস্তি এবং ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের কথা প্রচার করে তাঁরা জার্মানগণকে সৎপথে থাকতে অনুপ্রাণিত করেন। এর ফলে এই অর্ধসভ্য জাতিগুলির সভ্য হবার পথ প্রস্তুত হয়েছিল।

মধ্যযুগে রোমান ও জার্মান জনগণ একসঙ্গে বসবাস করতে থাকে। তারা একই ধর্মে দীক্ষিত ছিল। শীঘ্রই তাদের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এসকল কারণে রোমান ও জার্মানরা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় এবং এক নূতন সভ্যতার উৎপত্তি ঘটে। এই সভ্যতায় উভয়ের বৈশিষ্ট্যই বর্তমান ছিল। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে এই সভ্যতা উন্নত ও মার্জিত হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের এই সভ্যতা হয়ত গ্রীক-রোমান সভ্যতার তুলনায় কম উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও

এটি সভ্যতাই, বর্বরতা নয়। বরং অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত সময়কেই কিছু পরিমাণে অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে। কারণ এসময় মুসলমান, নর্থমেন ও ম্যাগিয়ারদের আক্রমণে ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছিল।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ	চতুর্থ হইতে সপ্তম শতক—অন্ধকার যুগ নয়
	অষ্টম হইতে দশম শতাব্দী—কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ

সারসংক্ষেপ ● মধ্যযুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা ঠিক নয়। বর্বর জার্মানদের আক্রমণে রোমান সভ্যতার ক্ষতি হলেও সেটি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। খ্রীষ্টান গীর্জা ও মঠগুলি শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রাখে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্র। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে জার্মানগণের মধ্যে পাপ-পুণ্যের বোধ জন্মায় এবং ধীরে ধীরে তারা সভ্য ও মার্জিত হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগকে কারা অন্ধকার যুগ বলত? এ বিষয়ে তোমার কি মনে হয়? ২। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলা যায় না কেন? ৩। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সেখানে শিক্ষার আলো কে জ্বালিয়ে রেখেছিল? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৪। এক কথায় উত্তর দাও:—

(ক) খ্রীষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতককে কি বলা হয়ে থাকে? (খ) সন্ন্যাসীরা কোথায় বাস করতেন? (গ) বর্বরদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ কারা জাগিয়েছিলেন?

(ঘ) কোন্ ধর্মের প্রভাবে বর্বর জাতিগুলি সভ্য হয়েছিল?

ঙ) মূল্যবান পুঁথিগুলি কারা নকল করে রাখতেন?

বাইজাণ্টাইন সভ্যতা

সম্রাট কন্‌স্ট্যাণ্টাইন কর্তৃক কন্‌স্ট্যান্টিনোপল নগরীর প্রতিষ্ঠা ● বাইজান্টিয়ামের সরকারী ধর্ম রূপে খ্রীষ্টধর্মের স্বীকৃতিলাভ ● সম্রাট জাষ্টিনিয়ান-এর ঐক্যবদ্ধ রোমান সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা ● জাষ্টিনিয়ানের আইন সঙ্কলন ও তার গুরুত্ব ● স্থাপত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ● বাইজান্টিয়ামের গুরুত্ব।

কন্‌স্ট্যান্টিনোপল ঃ তোমাদের কন্‌স্ট্যান্টিনোপল নগরীর কথা আগে বলেছি। এই নগরীটির প্রতিষ্ঠাতা রোমান সম্রাট কন্‌স্ট্যাণ্টাইন। তিনি ৩২৩ থেকে ৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দুটি কারণে কন্‌স্ট্যাণ্টাইন বিখ্যাত হয়ে আছেন ঃ (১) রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে কন্‌স্ট্যান্টিনোপল-এর প্রতিষ্ঠা, (২) খ্রীষ্টধর্মকে একটি বৈধ বা আইন সঙ্গত ধর্ম বলে মেনে নেওয়া এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করা।

বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরটিই কন্‌স্ট্যান্টিনোপল। 'কন্‌স্ট্যান্টিনোপল' একটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ হল, কন্‌স্ট্যাণ্টাইনের নগরী। বস্‌ফোরাস প্রণালী কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগর যুক্ত করেছে। এই বস্‌ফোরাস প্রণালার পশ্চিম তীরে বাইজান্টিয়াম নামে এক গ্রীক উপনিবেশ ছিল। সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন এখানে রোমান সাম্রাজ্যের জন্য একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন (৩৩০ খ্রীঃ)। পুরানো রাজধানী ছিল রোমে। কন্‌স্ট্যান্টিনোপলে নূতন রাজধানী করার কতকগুলি কারণ ছিল। (১) এ সময় সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে বর্বর জাতিগুলি হানা দিচ্ছিল। রোম অপেক্ষা কন্‌স্ট্যান্টিনোপল থেকেই এদের আক্রমণ রোধ করা বেশী সুবিধাজনক ছিল। (২) কন্‌স্ট্যান্টিনোপল-এর অবস্থান ছিল ইউরোপ ও এশিয়া এবং কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগস্থলে। ফলে এটি এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হতে পারবে। রোমান সাম্রাজ্যের 'শস্যভাণ্ডার' মিশর থেকে এখানে খাদ্যশস্য নিয়ে আসাও অনেক সহজ হবে।

কন্‌স্ট্যান্টাইন কন্‌স্ট্যান্টিনোপলকে একটি সুরক্ষিত নগরী ও বন্দর করে গড়ে তুলেছিলেন। ফলে এটি দীর্ঘকাল ধরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। কন্‌স্ট্যান্টাইন এই নগরীটিকে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প, স্থাপত্য ও খ্রীষ্ট ধর্মের কেন্দ্র করে তোলেন। এই সুসজ্জিত নগরীকে রোমের আদর্শেই গড়ে তোলা হয়। এজন্য একে নূতন রোমও বলা হত। পরবর্তীকালে এই কন্‌স্ট্যান্টিনোপলই পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়ে ওঠে। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত। এই সাম্রাজ্যে গ্রীক শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবই ছিল বেশী। তাই একে "গ্রীক সাম্রাজ্য"-ও বলা হয়ে থাকে।



সম্রাট কন্‌স্ট্যান্টাইন

খ্রীষ্টধর্ম ঃ কন্‌স্ট্যান্টাইনের পূর্ববর্তী অধিকাংশ সম্রাট খ্রীষ্টানদের ওপর নানা ভাবে নির্যাতন চালাতেন। মিথ্যা অভিযোগ বা বিনা কারণে কত খ্রীষ্টানের যে প্রাণ নেওয়া হয়েছিল তার সীমা-সংখ্যা নেই। অনেক সময় তাদের বুনো বাঘ সিংহের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু অমানুষিক অত্যাচার করেও খ্রীষ্টানদের দমন করা সম্ভব হয়নি। বরং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছিল। খ্রীষ্টানরা ছিল খুবই সঙ্ঘবদ্ধ। প্রথমে ক্রীতদাস, কারিগর, শ্রমিক, প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এই ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। শীঘ্রই মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই ধর্মে দীক্ষিত হয়। বুদ্ধিমান সম্রাট কন্‌স্ট্যান্টাইন বুঝলেন, খ্রীষ্টানদের আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। বরং এদের সমর্থন পাওয়া গেলে সাম্রাজ্য বেশ শক্তিশালী হয়ে

উঠবে। কারণ খ্রীষ্টধর্ম মানুষকে নত ও অনুগত হতেই-শেখায়। কথিত আছে, কন্‌স্ট্যাণ্টাইন তাঁর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে আকাশে বিরাট ক্রুশ চিহ্ন দেখেন। ক্রুশের সঙ্গে লেখা ছিল 'এই চিহ্ন নিয়ে জয়ী হও।' সেই রাতেই যীশুখ্রীষ্ট স্বপ্নে কন্‌স্ট্যাণ্টাইনকে দেখা দিয়ে তাঁর পতাকায় ক্রুশ চিহ্ন এঁকে নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ মেনে নেওয়ায় ফলেই নাকি কন্‌স্ট্যাণ্টাইন জয়ী হয়েছিলেন। যীশুখ্রীষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য কনস্ট্যাণ্টাইন ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মকে বৈধ ধর্ম বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে খ্রীষ্টানদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হয় এবং তারা নানা সুযোগ সুবিধা লাভ করে। অবশ্য কন্‌স্ট্যাণ্টাইনের আগে সম্রাট গ্যালেরিয়াসই সর্ব প্রথম খ্রীষ্টানদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (৩১১ খ্রীঃ)। কন্‌স্ট্যাণ্টাইন খ্রীষ্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র ধর্ম বলে ঘোষণা করেননি। এই ঘটনাটি ঘটে সম্রাট থিয়েডোসিয়াস-এর আমলে (৩৭৯-৩৯৫ খ্রীঃ)। কন্‌স্ট্যাণ্টাইন নিজের মৃত্যুর কিছু দিন আগেমাত্র খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কন্‌স্ট্যাণ্টাইন অবশ্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার আগেই খ্রীষ্টান গীর্জাকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্মে যাতে কোন মত পার্থক্য না থাকে তার জন্য তিনি খ্রীষ্টান বিশপ বা যাজকদের একটি সম্মেলনও বসান। কন্‌স্ট্যাণ্টাইনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই পরবর্তী কালে খ্রীষ্টধর্ম রোমান রাষ্ট্রের ধর্মরূপে গণ্য হয়েছিল।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান ঃ বর্বর জাতিগুলি পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য দখল করে নেওয়ায় রোমানগণ মোটেই খুশী হয়নি। কেউ কেউ হতাশ হয়ে ধর্মেকর্মে মন দেয়। কেউ বা আবার বর্বরদের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে। আর একদল লোক বর্বরদের তাড়িয়ে দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যকে এক করার স্বপ্ন দেখতে থাকে। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট জাস্টিনিয়ান এই ধরনেরই স্বপ্ন দেখতেন। পশ্চিম ইউরোপের বর্বর রাজারা মুখে জাস্টিনিয়ানের আনুগত্য স্বীকার করলেও কার্যতঃ তাঁরা ছিলেন

স্বাধীন। জাস্টিনিয়ান তাদের বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। তিনি পূর্বের ঐক্যবদ্ধ রোমান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জাস্টিনিয়ানের জন্ম হয়। তার কাকা জাস্টিন সাধারণ সৈনিক থেকে পূর্বাঞ্চলের সম্রাটপদ লাভ করেন। জাস্টিনের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি তাঁর ভাইপো জাস্টিনিয়ানকে (৫২৭-৫৬৫ খ্রীঃ) সিংহাসন দিয়ে যান। জাস্টিন ভাইপোর শিক্ষাদীক্ষা ও শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। জাস্টিনিয়ান ছিলেন অসাধারণ গম্ভীর, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। ভাগ্যগুণে তিনি দুটি অমূল্য রত্ন লাভ করেন। একটি তাঁর অপূর্ব সুন্দরী ও অশেষ গুণবতী রাণী থিওডোরা এবং অন্যটি তার প্রতিভাবান সেনাপতি বেলিসেরিয়াস। বুদ্ধিমতী থিওডোরা সম্রাটকে নানা সুপরামর্শ দিতেন এবং বেলিসেরিয়াস নানাদেশ জয় করে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

এই সময় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু ছিল পারস্য। বেলিসেরিয়াস পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্যলাভ করলেও জাস্টিনিয়ান পারস্য সম্রাট প্রথম খসরু-র সহিত 'চিরকালের জন্য' শান্তি স্থাপন করেন। এজন্য তিনি পারস্য সম্রাটকে প্রচুর সোনা দিতে বাধ্য হন। জাস্টিনিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল, পারস্যের সহিত শান্তি স্থাপন করে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে মন দেওয়া। কিন্তু পারস্য সম্রাট আট বছর পরেই রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রচুর অর্থ দিয়ে জাস্টিনিয়ান পারস্যের সহিত আবার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এরপর তিনি সেনাপতি বেলিসেরিয়াসকে উত্তর আফ্রিকা দখল করার নির্দেশ দেন। এ সময় ভ্যাণ্ডালগণ এখানে রাজত্ব করছিল। বেলিসেরিয়াস সহজেই ভ্যাণ্ডালগণকে পরাজিত করেন। বহু দুর্গ ও প্রাচীর নির্মাণ করে তিনি এই অঞ্চলকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সিসিলি প্রভৃতি দ্বীপও ভ্যাণ্ডালদের হাত থেকে তিনি কেড়ে নেন। অতঃপর জাস্টিনিয়ানের নির্দেশে বেলিসেরিয়াস ইটালী আক্রমণ করেন। অষ্ট্রোগথরা তখন

শাসন করছিল। বেলিসেরিয়স দীর্ঘ সংগ্রামের পর ইটালী অধিকার করেন (৫৪০ খ্রীঃ)। অস্ট্রোগথগণ তাদের নূতন নেতা টোটিলা-র নেতৃত্বে শীঘ্রই ইটালীর অধিকাংশ স্থান পূর্ণদখল করতে সমর্থ হয়। জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি নার্সেস দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর



অনুচরবর্গসহ সম্রাট জাস্টিনিয়ান

ইটালীতে পুনরায় সম্রাটের আধিপত্য স্থাপন করেন। জাস্টিনিয়ান ভিসিগথদের হাত থেকে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব অংশটিও অধিকার করেন। তিনি অবশ্য গল ও ব্রিটেন দখল করার কোন চেষ্টা করেননি।

জাস্টিনিয়ান পূর্বের রোমান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। বরং এটি করতে গিয়ে তিনি নিজের সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলে বিরামহীন যুদ্ধ চালিয়ে তিনি অজস্র অর্থ ও অসংখ্য লোকক্ষয় করেন। যুদ্ধের ব্যয় তাঁর প্রজাদেরই বহন করতে হয়। অসাধু কর্মচারীরা প্রচুর কর আদায় করে তার সামান্য-ভাগ রাজকোষে জমা দিত। করভারে প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু রাজ-

কোষ শূন্য থেকে যায়। জাস্টিনিয়ানের যুদ্ধের ফলে শুধু আফ্রিকা ও ইটালীতে এক কোটি লোক মারা গিয়েছিল। ইটালীতে নেমে এসেছিল শ্মশানের নিস্তব্ধতা। বিজিত স্থানগুলি রক্ষা করতেও সম্রাটকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এজন্য যে অর্থ ও সৈন্যের প্রয়োজন হত তা' জাস্টিনিয়ানের ছিল না। ইটালী থেকে তুর্ধর্ষ গথদের বিতাড়িত করায় লম্বার্ড প্রভৃতি জাতি সেখানে ঢুকে পড়ে। তাদের বাধা দেবার ক্ষমতা রোমান সম্রাটের ছিল না। ফলে ইটালীয়দের তুর্দশার সীমা থাকে না।

জাস্টিনিয়ান যখন পশ্চিম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত তখন উত্তর দিক থেকে স্লাভজাতি পূর্ব সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়ছিল। পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পারস্য সাম্রাজ্যেরও শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল। সম্রাটের উচিত ছিল আলেয়ার পেছনে না ঘুরে নিজ রাজ্যকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করা। কিন্তু তুঃখের বিষয়, এদিকে তাঁর মনোযোগ ছিল না।

জাস্টিনিয়ানের প্রধান খ্যাতি রাজ্যজয়ের জন্য নয়। রোমান আইন সঙ্কলন, গীর্জা, অট্টালিকা প্রভৃতির নির্মাণের জন্যই তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।

জাস্টিনিয়ান চেয়েছিলেন, ঐক্যবদ্ধ রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র রোমান আইন ও রোমান বিচার পদ্ধতি চালু করতে। কিন্তু তখন রোমান আইনের সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল। ফলে বিচারকদের অত্যন্ত অসুবিধা হত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য জাস্টিনিয়ান উল্লেখযোগ্য রোমান আইনসমূহ, বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের অভিমত প্রভৃতি সাজিয়ে গুছিয়ে একটি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটি 'কর্পাস জুরিস সিভিলিস' নামে খ্যাত। প্রচলিত আইনগুলির অনেক ত্রুটিও তিনি দূর করেছিলেন। জাস্টিনিয়ানের সঙ্কলন গ্রন্থের চারটি অংশ: (১) কোড, (২) ডাইজেস্ট, (৩), ইনস্টিটিউটস্, (৪) নভেলস্।

কোড অংশে জাস্টিনিয়ান পর্যন্ত রোমান সম্রাটগণের উল্লেখযোগ্য আইনগুলি স্থান পেয়েছে। ডাইজেস্ট হল বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের অভিমত ও সিদ্ধান্তগুলির সুসম্বন্ধ সঙ্কলন। এগুলিকে বিচারকগণ যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। আইনের ছাত্রদের সুবিধার জন্য কোড ও

ডাইজেস্ট-এর একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরী করা হয়। এটি হল ইন্‌স্টিটিউটস্। জাস্টিনিয়ান ও তাঁর পরবর্তী কয়েকজন সম্রাটের বিভিন্ন আইনের সঙ্কলন "নভেলস্" নামে খ্যাত। আগে একজন উকিল বা বিচারপতিকে শতাধিক আইনগ্রন্থ পড়তে হত। জাস্টিনিয়ানের সংস্কারের ফলে তাঁদের ছটি গ্রন্থের বেশী দরকার হত না। রোমানদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল তাদের আইন। জাস্টিনিয়ান এই আইনগুলি সংগ্রহ করে না রাখলে সেগুলি কবে হারিয়ে যেত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আইন, সমাজ ও রাজনীতির ওপর জাস্টিনিয়ানের আইন-সঙ্কলন-এর প্রভাব অসামান্য। জাস্টিনিয়ানের আইন-সঙ্কলন অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য হলেও এটি বড্ড তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছিল। ফলে আইন-গুলি সব সময় যুক্তিসঙ্গত ভাবে সাজান হয়নি।

জাস্টিনিয়ান শুধু সাম্রাজ্যের ব্যাপারেই সর্বেসর্বা ছিলেন না। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সবার ওপরে। খ্রীষ্টান ধর্মে যাতে কোন মতভেদ না থাকে তার জন্যও তিনিও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে জাস্টিনিয়ান মোটেই সফল হতে পারেননি।

জাস্টিনিয়ানের আর একটি বড় কীর্তি হল অসংখ্য সুন্দর সুন্দর গীর্জা, প্রাসাদ, অট্টালিকা, নগর, দুর্গ ও প্রাচীর নির্মাণ করা। গীর্জা গুলির মধ্যে কনস্ট্যান্টিনোপল শহরে নির্মিত সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা সব থেকে বিখ্যাত। এটি আকারে বিশাল এবং দেখতে অপূর্ব সুন্দর। এটির দেয়ালে ও মেঝেতে সোনালী ও সবুজ রঙের কাঁচের চৌকোণা টুকরো বা মোজেইক বসানো। এগুলিতে আলো পড়লে সমস্ত গীর্জাটি রঙীন আলোর বন্যায় ভেসে যেত। এই গীর্জাটির খিলান ও গম্বুজগুলিও অপূর্ব। এই গীর্জায় রোমান ও প্রাচ্য স্থাপত্যরীতির মিশ্রণ দেখা যায়। এই গীর্জায় প্রবেশ করলে মনে হত, স্বর্গে ঈশ্বরের একেবারে কাছটিতে পৌঁছান গেছে। পরবর্তীকালে তুর্কী মুসলমানগণ কন্‌স্ট্যান্টিনোপল দখল করে সেণ্ট সোফিয়ার গীর্জাটিকে মসজিদে পরিণত করে।

জাস্টিনিয়ানের আমলে চিত্রবিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এই সময়কার অট্টালিকাদির দেয়ালে সুন্দর সুন্দর চিত্র (ফ্রেস্কো)

আঁকা হত। এই সময়কার পুঁথিগুলিতেও চমৎকার সব ছবি দেখা যায়।

জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর বাইজান্টিয়ান সাম্রাজ্য আরও প্রায় নয়শ' বছর টিকে ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ নানা গণ্ডগোল ও বৈদেশিক আক্রমণে এটি দুর্বল হয়ে পড়ে। তোমরা জান, ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল।

বাইজান্টিয়ান সাম্রাজ্যের গুরুত্ব : ইউরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব খুব বেশী। এর রাজধানী কন্‌স্ট্যান্টিনোপল ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের বিরাট বন্দর ও বাজার ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বণিকদের অতি প্রিয় স্থান। লাভজনক বাণিজ্যের ফলে সম্রাটদের প্রচুর আয় হত। এই অফুরন্ত আয়ের জন্যই জাস্টিনিয়ান অজস্র অর্থ অপচয় করেও দেউলিয়া হয়ে যাননি। জাস্টিনিয়ানের আমলে সমগ্র ভূমধ্যসাগরে সম্রাটের আধিপত্য স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন বহু বাণিজ্যপোত ও রণতরীর অধিকারী। সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত কন্‌স্ট্যান্টিনোপল দীর্ঘকাল ধরে পারসিক, আরব, তুর্কী প্রভৃতি জাতির আক্রমণ থেকে শুধু নিজেকেই বাঁচায়নি, সমগ্র ইউরোপকেও রক্ষা করেছে। এই সাম্রাজ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেই ক্ষান্ত হয় নি, তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য স্লাভ ও অন্যান্য বর্বর জাতিদের মধ্যে সভ্যতার বিস্তার ঘটায় এবং পশ্চিমাঞ্চলের ইউরোপীয়দের হাতে গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান পৌঁছে দেয়। বহুদিন ধরে সে এগুলি সযত্নে রক্ষা করেছিল। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল বাইজান্টিয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই সাম্রাজ্য শিক্ষাদীক্ষা, সূক্ষ্ম ও জটিল শিল্পকর্ম প্রভৃতিরও কেন্দ্র ছিল। এখানকার মোজেইক, মণি-মুক্তার অলঙ্কার, সূচী ও রেশমের ওপর নানা নক্সার কাজ বিদেশীদের তাক লাগিয়ে দিত। শুনে অবাক হবে, এখানকার লোকেরা বারুদের ব্যবহারও জানত। সব মিলিয়ে এই সভ্যতা ছিল সেযুগের আদর্শ।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ	—৩১৩	খ্রীষ্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যে বৈধধর্ম বলে স্বীকৃত
	—৩২৩-৩৭	সম্রাট কন্‌স্ট্যাণ্টাইনের রাজত্বকাল
	—৩৩০	কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপল নগরের প্রতিষ্ঠা
	—৫২৭-৫৬৫	সম্রাট জাস্টিনিয়ান

সংক্ষিপ্তসার—পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের উন্নত সভ্যতা বাইজাণ্টাইন বা বাইজাণ্টিয় সভ্যতা নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সম্রাট কন্‌স্ট্যাণ্টাইন। তিনি খ্রীষ্টধর্মকে একটি বৈধ ধর্ম বলে স্বীকার করে নেন। তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী জাস্টিনিয়ান বর্বর জাতিগুলির কবল থেকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের এক বড় অংশ অধিকার করতে সমর্থ হন। কিন্তু এটি করতে গিয়ে তিনি সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলেন। জাস্টিনিয়ানের প্রধান খ্যাতি কিন্তু রোমান আইনের সঙ্কলনের জন্য। প্রচলিত আইনগুলির বহু ত্রুটিও তিনি দূর করেছিলেন। তাঁর আইন-গ্রন্থটি 'কর্পাস জুরিস সিভিলিস' নামে খ্যাত। এটি চারিটি ভাগে বিভক্ত ছিল: (১) কোড, (২) ডাইজেস্ট, (৩) ইন্‌স্টিটিউটস্‌, (৪) নভেলস্‌। জাস্টিনিয়ান শিল্প ও স্থাপত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বাইজাণ্টিয় সাম্রাজ্য ব্যবসা বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল। এটি গ্রীক সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি দীর্ঘকাল ধরে চর্চা ও রক্ষা করে এবং পশ্চিমাঞ্চলের ইউরোপীয়দের হাতে সেগুলি পৌঁছে দেয়। সংক্ষেপে এই সভ্যতা ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং সে যুগের আদর্শ।

অনুশীলনী

১। কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপল কোথায় অবস্থিত ছিল? কেন এই নগর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? ২। কন্‌স্ট্যাণ্টাইন খ্রীষ্টধর্মকে কেন বৈধ ধর্ম বলে ঘোষণা করেন? ৩। জাস্টিনিয়ান পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ অংশ দখল করেন? এর ফল কি হয়েছিল? ৪। জাস্টিনিয়ানের আইন সঙ্কলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। ৫। সেণ্ট সোফিয়া গীর্জাটি সম্পর্কে কি জান? ৬। বাইজাণ্টিয় সাম্রাজ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সম্রাট —।

(খ) পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য—সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত ছিল। (গ) —ছিলেন জাস্টিনিয়ানের মহিষী।

(ঘ) বেলিসেরিয়স ছিলেন — সভাপতি।

(ঙ) পারস্যের সম্রাট — সহিত জাস্টিনিয়ান সন্ধি করেন।

৮। টীকা লেখ:

(ক) কর্পাস জুরিস সিভিলিস (খ) বেলিসেরিয়স (গ) সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা।

পঞ্চম অধ্যায়

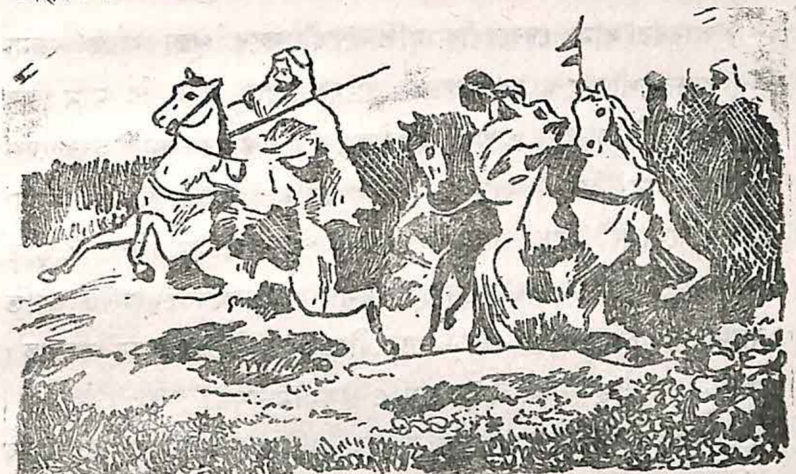
ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং তার প্রভাব

আরব দেশ ● হজরত মহম্মদ ● ইসলাম ধর্মের প্রসারের কারণ ● খলিফাগণ ও আরব সাম্রাজ্য ● কর্ডোভা ● ইসলামের কীর্তিতে ইউরোপের প্রতিক্রিয়া ● সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আরবগণের দান ● কয়েকজন আরব পণ্ডিত

বর্বর জাতিগুলির আক্রমণের ফলে পশ্চিম ইউরোপের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। পূর্ব রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান সেখান থেকে বর্বরদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করে জনসাধারণের দুর্দশা শতগুণে বৃদ্ধি করেন। পশ্চিম ইউরোপের জনগণ এই ক্ষতি সামলিয়ে ওঠার আগেই দক্ষিণ দিক থেকে তারা আবার আক্রান্ত হয়। এই নূতন আক্রমণকারীরা আরব দেশের লোক। এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আরব দেশের অবস্থান। এ দেশের অধিকাংশই মরুভূমি। সুতরাং জনসংখ্যাও খুব বেশী নয়। কিন্তু এই মরুময় আরব দেশেই হজরত মহম্মদ নামে এক মহামানবের জন্ম হয়। তিনি ইসলাম নামে এক নূতন ধর্ম প্রচার করে আরবদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। আরবগণ শুধু এক বিশ্বব্যাপী ধর্ম ও বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তারা পৃথিবীকে দিয়েছে এক নূতন ধরনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি—যার মান খুবই উঁচু। বুঝতেই পারছ, আরব দেশ ও আরব জাতি নানা দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ! এসো, সংক্ষেপে এদের কথা একটু বলে নিই।

আরব দেশটি একটি উপদ্বীপ অর্থাৎ এর তিনদিকেই জল। এর উত্তরে ইরাকদেশ, দক্ষিণে আরব সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। দেশটি লম্বায় ১৯২০ কিলো মিটারেরও (১২০০ মাইল) বেশী। আগেই বলেছি দেশটি মরুময়। এখানে আছে শুধু বালি আর পাহাড়। এখানে-ওখানে অবশ্য কয়েকটি ছোট ছোট শহর দেখা যায়। নদী-নালা ঝর্ণার সংখ্যা এখানে খুবই কম।

এদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও সামান্য। এখানকার আবহাওয়া খুবই শুক্নো ও জল নোনা। তাই ফসলের ফলন মোটেই ভাল নয়। শুধু আরবদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ও পূর্ব উপকূলের কিছু কিছু জায়গা মোটামুটি উর্বর। মরুভূমির কোথাও কোথাও ঝর্ণা দেখা যায়। বৃষ্টির জল জমা হয়ে ডোবারও সৃষ্টি হয় কোথাও কোথাও। ঐ সকল স্থানে খেজুর, বাবলা প্রভৃতি গাছ জন্মায়। এই জায়গাগুলির নাম মরূদ্যান বা মরুভূমির বাগান। উর্বর স্থানগুলিতে এবং মরূদ্যানে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে। যারা যাযাবর জীবন যাপন করে, মরুভূমিতে ঘোড়া বা উটে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, দরকারমত তাঁবুতে থাকে, তাদের বলা হয় বেদুইন। আরবের লোকেরা বিশেষ করে বেদুইনরা খুবই রুক্ষ প্রকৃতির। এরা অত্যন্ত সাহসী, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। আরবদের



বেদুইন

প্রধান জীবিকা সামান্য চাষবাস, পশুপালন, ও ব্যবসা-বাণিজ্য। বেদুইনরা পথিক, বণিকদল ও গ্রাম-নগরের উপর লুঠপাট চালিয়ে বেঁচে থাকত। বেদুইনরা অতিথিদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত। সাধারণতঃ তারা বন্ধু বা উপকারীর কোন ক্ষতি করত না। চাদর ও আলখাল্লা জাতীয় পোশাকে তাদের মাথা ও সারা শরীর ঢাকা থাকত। প্রচণ্ড রোদ থেকে বাঁচার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আবরদের প্রধান খাদ্য হল ছাগল, ভেড়া ও উটের মাংস এবং আটা, খেজুর ও উটের দুধ। তাদের প্রধান বাহন উট ও ঘোড়া। আরবগণ পরিবারে বাস করত। কয়েকটি পরিবার মিলে হত একটি গোষ্ঠী। কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে তৈরী হত একটি উপজাতি। আরব দেশে বিভিন্ন উপজাতি বাস করত। গোষ্ঠীর নেতাকে বলা হত শেখ। তাঁর কথা সকলে মেনে চললেও তিনি যা খুশী তাই করতে পারতেন না! আরবগণ বিশেষ করে বেদুইনরা খুবই স্বাধীনতাপ্রিয়। আরবদের মধ্যে একটা অদ্ভূত রীতি চালু ছিল। এক গোষ্ঠীর কেউ অন্য গোষ্ঠীর কোন লোককে হত্যা করলে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়ে যেত। আরম্ভ হত খুনের বদলে খুন। এই শত্রুতা সময় সময় ৪০ বছর ধরেও চলত।

আরবরা নানা দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করে পূজা করত এজন্য আরবদের পৌত্তলিক বলা হত। তাদের প্রধান মন্দিরের নাম ছিল কাবা। এটি আরবের প্রধান শহর মক্কাতে অবস্থিত। সমগ্র আরবদেশ কখনও কোন বিদেশী জাতির অধীন হয়নি। বরং, আরবগণ নানা যুগে মেসোপটেমিয়া, সুমের, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর প্রভৃতি দেশে গিয়ে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। আরবগণ সেমেটিক জাতি নামে পরিচিত। এই জাতি পৃথিবীকে তিনটি ধর্ম দান করেছে। সেগুলি হল, ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম।

হজরত মহম্মদঃ আরবদেশের পশ্চিম উপকূলের মাঝামাঝি স্থান থেকে কিছু ভেতরের দিকে মক্কা ও মদিনা শহর অবস্থিত। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরের নামকরা কূরেশ বংশে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আহম্মদ নামেও পরিচিত। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতা আবদুল্লার মৃত্যু ঘটে। মহম্মদের বয়স মাত্র যখন ছয় বছর তখন তাঁর মা আমিনা মারা যান। মহম্মদ ঠাকুর্দা ও কাকার কাছে মানুষ হন। তাঁর কাকার নাম আবুতালিব। ছোট বেলায় মহম্মদ অন্য আরব বালকদের মতই উট ও ভেড়া চরাতেন। লেখাপড়া শেখার বিশেষ সুযোগ তিনি পাননি। কাকার সঙ্গে একবার তিনি সিরিয়ায় গিয়ে-

ছিলেন। সেখানে তিনি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের দেখে থাকবেন। মক্কাতেও ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের আনাগোনা ছিল। তাদের কাছে থেকে তিনি নিশ্চয়ই এক-ঈশ্বরের আরাধনার কথা শুনেছিলেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের উন্নত রীতি-নীতি ও আচার ব্যবহার হয়ত তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আরবদের বহু দেবতায় বিশ্বাস, অনুন্নত জীবনযাত্রা ও মারামারি তাঁর মোটেই ভাল লাগত না। তিনি এসব নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতেন এবং মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নও দেখতেন। মহম্মদ খাদিজা নামে এক ধনপতি বিধবার ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনার ভার নেন। পরে তিনি খাদিজাকে বিবাহ করেন। তাঁর বয়স তখন ২৫ এবং খাদিজার ৪০। এই বিবাহের ফলে মহম্মদের অবস্থা বেশ ভাল হয় এবং তিনি নির্জনে চিন্তা করার অবসর পান। এই সময় দেবদুত গ্যাব্রিয়েল বা জিব্রাইল তাঁকে দেখা দেন। দেবদূত মহম্মদকে একমাত্র ঈশ্বর আল্লাহ-র বাণী শুনিয়ে আরবদের মধ্যে তা প্রচার করতে বলেন। মহম্মদ প্রায়ই এই বাণী শুনতে থাকেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করেন। তাঁর এই ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম কথাটির অর্থ ঈশ্বরের নিকটে আত্মসমর্পণ। যারা এই ঈশ্বরের কথা মেনে চলে তারাই মুসলমান।

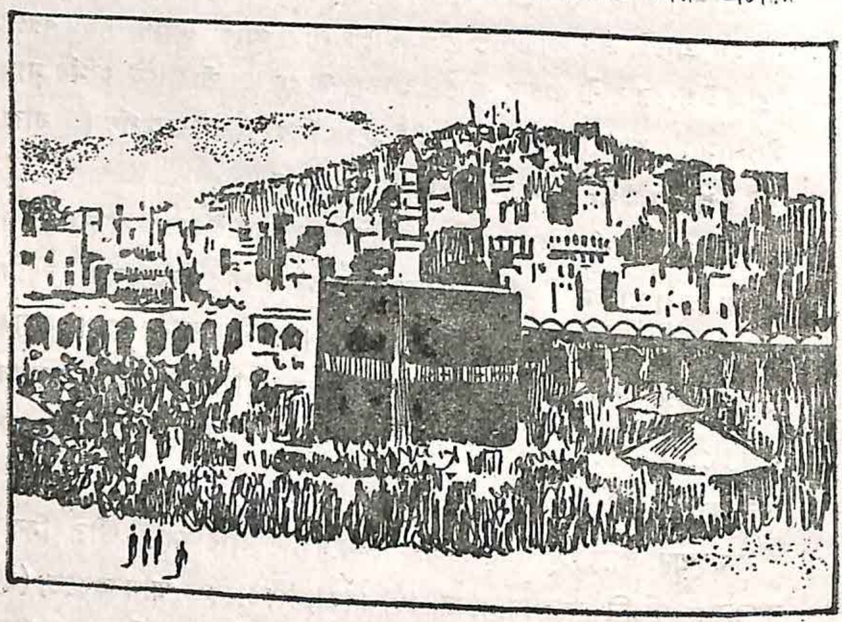
ইসলাম ধর্মের মূল কথা হল,— ঈশ্বর এক, বহু ঈশ্বরের ধারণা ভুল। তাঁকে দেখা যায় না। তিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তাঁর নাম আল্লাহ্। তিনি মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করে তাদের শাস্তি ও পুরস্কার দেন। পাপীদের নরকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পুণ্যবানেরা স্বর্গে নানা আমোদ-প্রমোদে দিন কাটায়।

মহম্মদ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য দেবদেবীর আরাধনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি মুসলমানদের (১) মাতা, পিতাকে সম্মান করতে, (২) স্ত্রী ও দাসদাসীর প্রতি ভাল ব্যবহার করতে, (৩) প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে, (৪) দীন-দুঃখীদের ভিক্ষা দিতে এবং (৫) দেহ ও মন শুদ্ধ করে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। তিনি

মুসলমানদের মদ না খেতেও নির্দেশ দেন। তাঁর মতে সকল মুসলমানই সমান ; কেউ উঁচু বা নীচু নয়। মহম্মদ নিজেকে ঈশ্বরের দূত বা পয়গম্বর বলে প্রচার করতেন। তাঁর মতে তিনিই ঈশ্বরের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর।

মহম্মদ ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সকল বাণী শুনেছিলেন সেগুলি তাঁর শিষ্যেরা কোরান শরীফ নামক গ্রন্থে লিখে রাখেন। এটি ১১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। কোরান মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কোরান মুসলমানদের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মুসলমানদের প্রার্থনা গৃহকে বলা হয় মসজিদ। মসজিদ না থাকলেও মুসলমানদের প্রার্থনায় কোন অসুবিধা হয় না। এই ধর্মে পুরোহিতদের প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।

প্রথম দিকে মহম্মদের স্ত্রী খাদিজা, বন্ধু আবুবকর ও অন্য দুজন ব্যক্তি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন। মক্কার অন্যান্য লোকেরা তাঁর প্রচারে



কাবা মসজিদ

কোন আগ্রহই দেখাত না। মক্কা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ও তীর্থস্থান হওয়ায় সারা আরব দেশ থেকে বহু লোক এখানে আসা-যাওয়া করত।

বছরের একটা বিশেষ সময়ে তীর্থযাত্রীরা কাবা-য় আসতে শুরু করলে এখানে গান-বাজনা ও কবিতা-প্রতিযোগিতাও চলত। তীর্থ যাত্রীদের কাছ থেকে মক্কাবাসীদের বেশ ভালই আয় হত। কাবা হল একটি চৌকো পাথরে গড়া মন্দির। এর একটি কুঠরীর দেয়ালে একখণ্ড কালো পাথর গাঁথা আছে। এটি সম্ভবত: আকাশ থেকে ছিটকে পড়া উল্কা পিণ্ড। আরবরা এই পাথরটিকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করত। মন্দিরটিতে আরব দেশের নানা দেবদেবীর মূর্তিও ছিল। মহম্মদ তীর্থযাত্রীদের কাছে মূর্তি-পূজার নিন্দা শুরু করায় মক্কাবাসীরা খুবই রেগে গেল। কারণ এর ফলে লোকে আর কাবা মন্দিরে না-ও আসতে পারে। তীর্থযাত্রী না এলে মক্কাবাসীদের আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা নানা ভাবে মহম্মদের বিরোধিতা শুরু করল। বেশ কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় মক্কাবাসীদের শত্রুতাও বেড়ে গেল। মক্কার উত্তর দিকে ছিল মদিনা শহর। মক্কার সঙ্গে মদিনার সম্পর্ক ভাল ছিল না। মদিনাবাসীরা মহম্মদকে মদিনায় চলে আসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাল। মক্কাবাসীরা মহম্মদকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে মহম্মদ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মদিনায় চলে আসেন। মুসলমানগণ এই তারিখ থেকে একটি নূতন অব্দ চালু করে। এটি হিজ্‌রা নামে পরিচিত।

মদিনাবাসীরা মহম্মদকে তাদের অধিপতি ও ধর্মগুরু বলে মেনে নিল। মহম্মদ একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে মক্কাবাসীদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। মক্কাবাসীরাও এর পাল্টা আক্রমণ চালায়। শেষ পর্যন্ত মহম্মদই জয়ী হন। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কাবাসীরা ইসলাম ধর্ম ও মহম্মদকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মহম্মদ কাবার মূর্তিগুলি ধ্বংস করলেও কাবাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেন। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৬২ বছর বয়সে মহম্মদের মৃত্যু হয়। আরব দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মহম্মদের অধীন হয়েছিল বলে জানা যায়।

ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের বহু বিষয়ে মিল আছে। আরবগণ এই সহজ ও সরল ধর্মমত গ্রহণ করে মার্জিত ও ভদ্র হয়।

হানাহানি ভুলে গিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পৃথিবীর সর্বত্র তাদের এই নূতন ধর্ম প্রচার করার জন্য বেরিয়ে পড়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর এক বিশাল অংশে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সাফল্যের মূলে ছিল নানা কারণ (১) মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইসলাম ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম। স্বয়ং ঈশ্বর মহম্মদকে দিয়ে এই ধর্ম প্রচার করিয়েছেন। সুতরাং মুসলমানগণ এই ধর্ম প্রচার করার চেষ্টা করলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন। এই বিশ্বাস ইসলামের প্রচারকদের প্রচণ্ড ভাবে উৎসাহিত করেছিল। (২) আরব দেশের বেদুইনরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তারা বিভিন্ন দেশ জয় করে ইসলাম ধর্ম বিস্তারে সাহায্য করে। (৩) মহম্মদের উত্তরাধিকারীদের কয়েকজন খুবই যোগ্য ছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। (৪) মহম্মদের ধর্মমত ছিল খুবই সহজ ও সরল। এই সময় ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্ম অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছিল। সুতরাং বিভিন্ন দেশের জনগণ সাগ্রহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। (৫) এই সময় পারস্য ও বাইজান্টিয় সাম্রাজ্য বেশ দুর্বল হয়ে পড়ায় আরবদের পক্ষে রাজ্য বিস্তার করা সহজ হয়েছিল। (৬) আরবগণ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে মোটেই ভয় পেত না। মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন বলে তারা মনে করত। তাই তারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে যুদ্ধ করত। তাদের ঠেকান ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

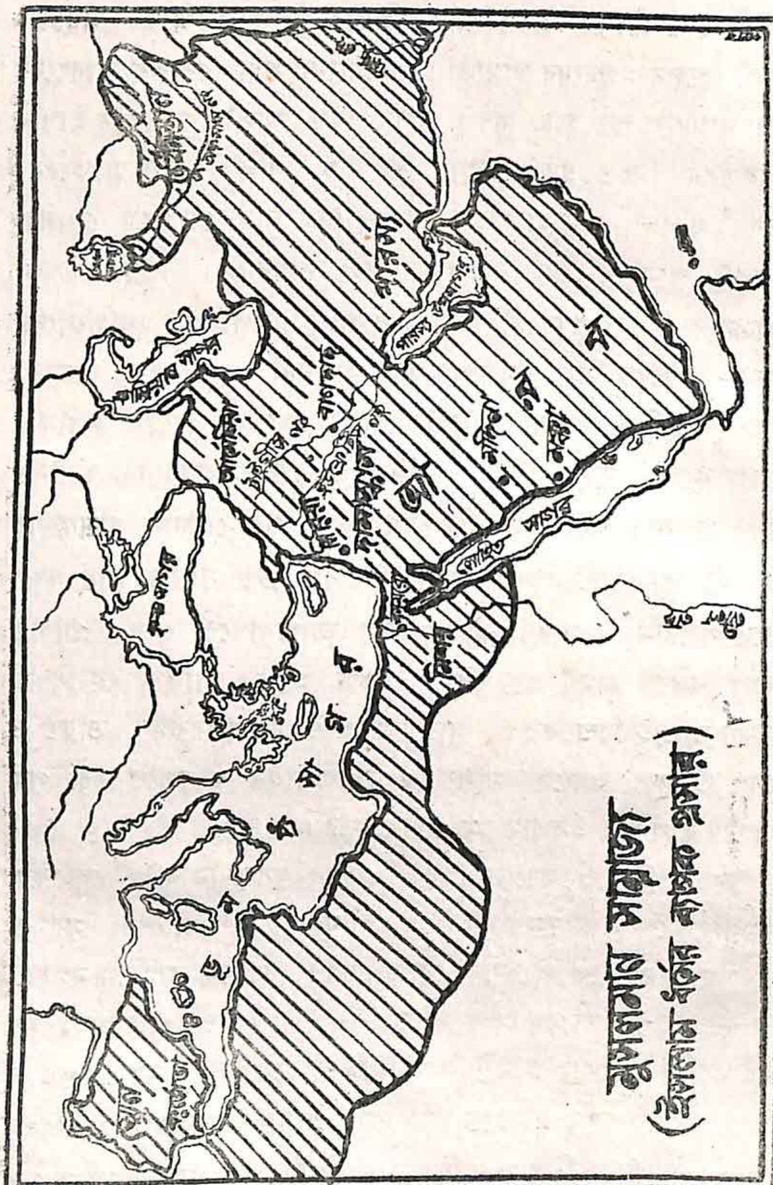
মহম্মদের উত্তরাধিকারীরা খলিফা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আরব রাজ্যের অধিপতি ও ধর্মগুরু। প্রথম খলিফা রূপে নির্বাচিত হন মহম্মদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুচর আবুবকর (৬৩২-৬৩৪ খ্রীঃ)। তিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার সঙ্কল্প করেন। তাঁর আমলে সিরিয়া লুণ্ঠিত হয় এবং কয়েকটি শহর আরবের অধীনে আসে। পরবর্তী খলিফা ওমর (৬৩৪-৬৪৪ খ্রীঃ) বহু রাজ্য জয় করে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটান। তাঁর নেতৃত্বে আরবগণ সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ইউফ্রেটিস নদী উপত্যকা অঞ্চল,

ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, পারস্য ও মিশর দখল করে নেয়। পরবর্তী খলিফাগণ ছিলেন ওসমান (৬২৪-৬৫৬ খ্রীঃ) এবং আলী (৬৫৬-৬৬১ খ্রীঃ)। এই চারজন খলিফাই ছিলেন মহম্মদের অনুচর। আলী ছিলেন মহম্মদের জামাতা। ওসমানের সময় থেকেই আরবদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আলীর দুই পুত্র হাসান ও হোসেন নিহত হন। ইহার পর বহু খলিফা রাজত্ব করেন। পরবর্তী খলিফাদের মধ্যে হারুন-অল-রশীদের নাম বোধ হয় তোমরা সকলেই শুনেছ। তাঁর রাজধানী ছিল বাগদাদে। তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী, প্রজাদরদী ও বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষক। খলিফাদের আমলে ভারতের সিন্ধু ও মূলতান এবং অক্ষুনদী পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার তুর্কী জাতি আরবদের অধীনতা স্বীকার করে। সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন আরবদের অধীনস্থ হয়। ফ্রান্সেও তারা হানা দিতে থাকে। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্ট্যান্টিনোপল অবশ্য বার বার চেষ্টা করেও তারা দখল করতে পারেনি। আরব নৌবহর সমগ্র ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। একটি অনুন্নত জাতির এই বিরাট সাফল্য সত্যিই বিস্ময়কর। আরব বণিক ও ধর্মপ্রচারকগণ ভারত ও চীনেব উপকূল অঞ্চলে, মালয় ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে।

উত্তর আফ্রিকার মরক্কো থেকে একদল মুসলমান অষ্টম শতকের প্রথম দিকে স্পেন আক্রমণ করে। এরা মূর নামে পরিচিত। মূরগণ ভিসিগথদের হাত থেকে স্পেন কেড়ে নেয়। প্রথমে সেভিল নগরে, পরে কর্ডোভা-তে তাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। কর্ডোভায় বহু সুন্দর সুন্দর মসজিদ, প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। মসজিদগুলির জালির কাজ অপূর্ব। কর্ডোভার রাজ প্রাসাদ আল্‌হাম্‌রা জগৎ-বিখ্যাত। কর্ডোভা বিজ্ঞান ও শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করে।

আরব সাম্রাজ্য ও ইসলামের ব্যাপক প্রসারে ইউরোপ অত্যন্ত ভীত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য, স্পেনের ভিসিগথ ও

গলের ফ্রাঙ্কগণকে প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। ভূমধ্যসাগর আরবদের কবলে যাওয়ায় পশ্চিম ইউরোপের বণিকেরা এই



অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে তারা জীবিকার জন্য কেবলমাত্র জমির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পশ্চিম ইউরোপের সামন্তপ্রথার দ্রুত প্রসার ও বিকাশের এটি একটি প্রধান কারণ। ইউরোপ বেশী দিন চুপ করে বসে থাকেনি। স্পেনের মূরগণ গল দেশে প্রবেশ করলে ফ্রাঙ্কদের রাজার এক পদস্থ কর্মচারী মার্টেল তাদের দল থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন (৭৩২ খ্রীঃ)। কিন্তু মূরগণ ৭০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে স্পেনে রাজত্ব করেছিল। খ্রীষ্টধর্মের গুরু পোপদের উৎসাহে ইটালীর পিসা ও জেনোয়া নগরী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে নৌযুদ্ধ চালায়। শেষ পর্যন্ত তারা ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়। পোপগণ মুসলমানদের কবল থেকে খ্রীষ্টানদের পবিত্রভূমি জেরুজালেম দখল করার জন্য ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড শুরু করেন। ইউরোপের বহু রাজা, সামন্ত ও চাষী, এতে সাগ্রহে যোগ দিয়েছিল। ক্রুসেডগুলি সাময়িকভাবে ইসলামের প্রসার রোধ করেছিল। ইউরোপীয়গণ অবশ্য আরবদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য জেনেছিল। এর ফলে তারা যে অনেক সভ্য ও মার্জিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরবদের দান : আরবগণ ভারতবর্ষ, পারস্য, বাইজান্টিয় সাম্রাজ্য ও পশ্চিম ইউরোপের নানাস্থান দখল করে। এগুলির অধিকাংশই ছিল উন্নত সভ্যতার অধিকারী। এদের সংস্পর্শে এসে আরবগণ সুসভ্য হয়ে ওঠে। উন্নত জাতিগুলি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উন্নত করে তোলে। বিশ্বের সংস্কৃতিতে আরব তথা মুসলমানদের দান খুবই উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি ভাষাতে রচিত দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদি আরবী ভাষাতে অনুবাদ করা হয়। আরবগণই এগুলি ইউরোপে পৌঁছে দিয়েছিল। আরবের কবি-সাহিত্যিকরাও প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করেন। আরব্য রজনীর গল্পগুলিতো বিশ্ববিখ্যাত। কাগজ তৈরীর কৌশল, ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার, বীজগণিত, পৃথিবী যে গোলকের মত—এই

ধারণা, রসায়ন শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান—এ সমস্তই আরবগণ চীন, ভারত প্রভৃতি দেশ থেকে শিখে ইউরোপীয়দের শিখিয়েছিল। কৃষি, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প ও স্থাপত্যেও আরবদের দান কম ছিল না। মসজিদগুলিতে জালি ও নক্সার কাজ, খিলান, গম্বুজ প্রভৃতি আরব শিল্প ও স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আরবগণ শিক্ষার প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দিত। বাগদাদ, কর্ডোভা ও কায়রো শিক্ষাদীক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। আরবগণ বড় বড় গ্রন্থাগার স্থাপন করেও তাদের শিক্ষাপ্রীতির পরিচয় দিয়েছিল।

আরবের পণ্ডিত : আরব সাম্রাজ্যে বেশ কিছু উচুস্তরের পণ্ডিত, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমরা মাত্র কয়েকজনের কথা উল্লেখ করব। বিখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদ আবু সিনা নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে অল্‌-তবারি, ও ইব্‌ন্‌ খলদুন বিখ্যাত। অল্‌-তবারি আরবদের মধ্যে প্রথম প্রকৃত ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ইব্‌ন্‌ খলদুন-এর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'মকদ্দমা'। এটি হল মুসলমান শাসিত আরব, পারস্য ও উত্তর আফ্রিকার বিস্তারিত ইতিহাস।

কর্ডোভার দার্শনিক ইব্‌ন্‌ রুশ্‌দ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের অনুগামী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধর্মের আওতা থেকে মুক্ত করেছিলেন। চিকিৎসাবিদ হিসাবেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ইব্‌ন্‌ ইশাক ছিলেন মস্ত বড় চিকিৎসক, পণ্ডিত ও অনুবাদক। তিনি গ্রীক ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ক বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে চিকিৎসাবিদ অল্‌-রাজী, বিজ্ঞানী অল্‌-কিন্দি, গণিতবিদ অল্‌-খোওয়ারিজ্‌মি ও কামাল-অল-দীন, গণিতজ্ঞ ও কবি ওমর খৈয়াম প্রভৃতি বিখ্যাত। ভারতের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে একটি অতি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছিলেন পণ্ডিত অল্‌-বীরুণী। পর্যটক ইব্‌ন্‌ বতুতার গ্রন্থ থেকে ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা

যার। আরবের পণ্ডিতদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই তোমরা অনুমান করতে পারবে, আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি কতটা উঁচুমানের ছিল।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ	—৫৭০	হজরত মহম্মদ-এর জন্ম
	—৬২২	হিজরা অব্দের শুরু
	—৬৩২	হজরত মহম্মদের মৃত্যু
	—৬৩২-৬৩৪	খলিফা আবুবকর
	—৬৩৪-৬৪৪	,, ওমর
	—৬৪৪-৬৫৬	,, ওসমান
	—৬৫৬-৬৬১	,, আলী
	—৭৩২	চার্লস মার্টেল-এর হাতে মুসলমানদের পরাজয়

সংক্ষিপ্তসার ◎ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশই মরুভূমি। এখানকার বাসিন্দারা, বিশেষ করে বেদুইনগণ দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। তারা বহু দেবদেবীর পূজা করতে অভ্যস্ত ছিল। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ আরবের মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একেশ্বরবাদী এক নতুন ধর্ম প্রচার করেন, এর নাম ইসলাম। পৌত্তলিক মক্কাবাসীদের শত্রুতার ফলে মহম্মদ মদিনায় পলায়ন করতে বাধ্য হন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মক্কা দখল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা চীনের সীমানা থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং তার বাইরেও ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। আরবগণ নানা দেশের সভ্যতা আয়ত্ব করে এক অত্যুন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল। নানা পণ্ডিতের দানে এই সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ইউরোপীয়গণ আরবদের বিরোধিতা করলেও তারা বহু জিনিস আরবদের কাছে থেকেই শিক্ষা করেছিল।

অনুশীলনী

১। আরব দেশটি কোথায় অবস্থিত? এ দেশটির মাটি কিরূপ? এ দেশের দুটি শহরের নাম লেখ। ২। কাদের বেদুইন বলা হয়? আরবদের প্রধান খাদ্য কি? তারা কেমন পোষাক পরত? ৩। হজরত মহম্মদ কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে কি জান?

৪। হজরত মহম্মদ কোন্ ধর্মের প্রচার করেন ? এর মূল কথা কি ?

৫। খলিফা কাদের বলা হত? প্রথম চারজন খলিফা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৬। আরবদের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল। স্পেন কারা দখল করে ? কর্ডোভা সম্বন্ধে কি জান ?

৭। কি কি কারণে ইসলাম ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল ?

৮। মুসলমানদের রাজ্যবিস্তার ইউরোপীয়দের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ?

৯। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবদের দান সম্পর্কে লেখ।

১০। কয়েকজন আরব পণ্ডিতের নাম কর। তাঁদের সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

১১। দু'এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আরব দেশের কোন্ অঞ্চল উর্বর ?

(খ) কাবা কি ?

(গ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে কি ঘটেছিল ?

(ঘ) হিজরা কি ?

(ঙ) গ্যাব্রিয়েল কি ?

(চ) কোরান কাদের পবিত্র গ্রন্থ ?

(ছ) হজরর মহম্মদের মৃত্যু কখন ঘটেছিল ?

(জ) আবু সিনা কে ছিলেন ?

(ঝ) অল্-বীরুনী কোন্ দেশ সম্পর্কে বই লিখে গেছেন ?

১২। ভুল সংশোধন কর :

(ক) হজরত মহম্মদ প্রথম পয়গম্বর।

(খ) ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন আবুবকর।

(গ) প্রথম খলিফার নাম হারুণ-অল-রশীদ।

(ঘ) মূরগণ আরব দেশের লোক।

(ঙ) কর্ডোভা পারস্যে অবস্থিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

(৯০০—১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রথম পরিচ্ছেদঃ শার্লেমেন

শার্লেমেন ● পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ● শার্লেমেনের অভিষেক ও উহার গুরুত্ব ● রাষ্ট্র ও গীর্জার সম্পর্ক ● শার্লেমেনের দরবার ● শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ● মঠ ও মঠের জীবন ● ক্লুনীর সংস্কার ● ইন্‌ভেষ্টিচার সমস্যা ● বিশ্ববিদ্যালয়।

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানগণ প্রচণ্ড বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয় কিন্তু অষ্টম শতকে ইসলামের এই দুর্দম বন্যা রুখে দেয় ইউরোপ। পূর্বদিকে কন্‌স্ট্যান্টিনোপল এবং পশ্চিমে ফ্রাঙ্কগণের কাছে হার স্বীকার করতে হয় ইসলামের অপরাজেয় সৈন্যবাহিনীকে। ইসলামের অগ্রগতিকে রুখে দিলেও ইউরোপের অবস্থা এই সময় মোটেই ভাল ছিল না। এই সময় পূর্বাঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্যেও চলছিল ধর্মীয় ব্যাপারে গুরুতর মতভেদ। একদল লোক যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টান সাধু সন্ন্যাসীদের মূর্তি বা ছবিকে দেবতার মত পূজা করছিল। অন্যেরা, বিশেষ করে স্বয়ং সম্রাট মূর্তিপূজারীদের নিষ্ঠুর ভাবে দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে সাম্রাজ্যের সর্বত্র মূর্তি ভাঙ্গা শুরু হয়। রোমের পোপ একারণে সম্রাটের ওপর খুবই রুষ্ট হন এবং তাঁকে বিধর্মী বলে ঘোষণা করেন। এই সময় কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট ছিলেন নাবালক ষষ্ঠ কন্‌স্ট্যান্টাইন। সম্রাটের মাতা আইরিনি পুত্রকে পদচ্যুত ও অন্ধ করে নিজেই সিংহাসনে বসেন। রোমের পোপ ও রোমানগণ সম্রাটের সিংহাসনে এক নারীর উপবেশনকে মেনে নিতে পারল না। তাঁদের ধারণায় সম্রাটের আসন শূন্য হয়ে গেছে। বর্বর জাতিগুলির আক্রমণ থেকে রোম ও রোমানদের রক্ষা করবার কোন চেষ্টাই করেননি

পূর্বাঞ্চলের সম্রাটগণ। অথচ আইন অনুসারে তাঁরাই ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের কর্তা। কারণ পশ্চিমাঞ্চলের অধিপতি জার্মানগণ কাগজে-কলমে পূর্ব রোমান সম্রাটের আধিপত্যই মেনে নিয়েছিল। এই সকল কারণে পোপ ও রোমানদের মনে এক নূতন চিন্তা দেখা দেয়। যে করেই হোক এক শক্তিশালী সম্রাট তাদের চাই-ই। তিনি হবেন সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট।

শার্লেমেন ঃ সম্রাট খোঁজার ব্যাপারে পোপই উদ্যোগী হলেন। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের শক্তিশালী ফ্রাঙ্ক রাজাদের সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব ছিল। বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কিছু অংশ নিয়ে ফ্রাঙ্ক রাজ্য গঠিত ছিল। এই রাজারা খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় পোপের বেশ সুবিধা হয়। ফ্রাঙ্করাজ পিপিন উত্তর ইটালীর লম্বার্ডদের আক্রমণ থেকে দু'বার পোপের রাজ্য রক্ষা করেছিলেন। ফ্রাঙ্ক ও লম্বার্ডগণ জার্মানদের দুটি শাখা। পিপিনের পুত্র শার্লেমেন শুধু লম্বার্ডদের দমন করেন নি, তিনি পোপ তৃতীয় লিওকে তাঁর রোমান শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। শার্লেমেন বহু রাজ্য জয় করে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারেও তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। পোপ লিও এই শার্লেমেন-এর মাথায় পরিয়ে দেন রোমান সম্রাটদের মুকুট। ঘটনাটি ঘটে রোমের সেন্ট পিটার গীর্জায়, ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, বড় দিনের উৎসবের সময়। শার্লেমেন যখন নতজানু হয়ে



সম্রাট শার্লেমেন

প্রার্থনা করেছিলেন, তখনই তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন পোপ লিও। সমবেত জনতা আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে, 'জয় হোক রোমান সম্রাট শার্লেমেনের, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে অভিষিক্ত করেছেন সম্রাট পদে।' এইভাবে এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে শার্লেমেন-এর অভিষেক সম্পন্ন হল। এই অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপে আবার একটি 'রোমান সাম্রাজ্য' স্থাপিত হয়। তিনশ' বছরেরও বেশী সময় ধরে এই অঞ্চলে যে রাজনৈতিক অনৈক্য চলছিল, তার অবসান ঘটল। এই সাম্রাজ্য 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' নামে পরিচিত। পবিত্র গীর্জার প্রধান, পোপ শার্লেমেন-এর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং পবিত্র গীর্জার সঙ্গে রোমান সম্রাটেরও সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হল। এজন্যই শার্লেমেনের সাম্রাজ্যের নাম পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। কিন্তু এই সাম্রাজ্যকে রোমানসাম্রাজ্য বলা মুস্কিল। এই সাম্রাজ্যের সম্রাট রোমান ছিলেন না। তিনি খাঁটি জার্মান।

অভিষেকের গুরুত্ব: শার্লেমেনের অভিষেকের কথা তো শুনলে। এখন এর গুরুত্ব সম্পর্কে দু'কথা বলি। আগেই বলেছি, (১) শার্লেমেনের অভিষেকের সময় থেকে অর্থাৎ ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের শুরু হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব বজায় থাকে। (২) বহুদিন থেকেই রোমান, জার্মান ও খ্রীষ্টধর্মের ঘনিষ্ঠতা চলছিল। এই অভিষেকের মধ্য দিয়ে এই তিনটির পূর্ণ-মিলন ঘটে। (৩) এই অভিষেকের ফলে পশ্চিম সাম্রাজ্য পূর্ব সাম্রাজ্য থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই অভিষেককে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালে সম্রাট ও পোপের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। পোপদের বক্তব্য, একজন পোপই শার্লেমেনকে মুকুট পরিয়েছিলেন। সুতরাং সম্রাট পোপের অধীনে থাকতে বাধ্য। অন্যদিকে সম্রাটগণ বলতে থাকেন, শার্লেমেন ছিলেন পোপের রক্ষক। সুতরাং তিনিই বড়। এই নিয়ে পরে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলবে সম্রাট ও পোপের মধ্যে। (৪) শার্লেমেন সম্রাট হওয়ায় তাঁর নিজের এবং জার্মান জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও ইটালীতে শান্তি স্থাপিত হয়। (৫) তবে

তখন থেকে জার্মানীর রাজাকে প্রায়ই ইটালীর দিকে মনোযোগ



দিতে হত। ফলে জার্মানীর বেশ ক্ষতি হতে থাকে। (৬) সম্রাট হবার

পর শার্লেমেন অর্ধসভ্য জার্মান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে রোমানসভ্যতা ছড়িয়ে দিতে বেশী সচেষ্ট হয়েছিলেন। শার্লেমেন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন বলেই পোপ তৃতীয় লিও তাঁকে সম্রাট করেছিলেন। এসো এবার শার্লেমেনের রাজ্যজয়, শাসন প্রভৃতি বিষয়ে দু'চার কথা বলি।

রাজ্য-জয়ঃ শার্লেমেন ছিলেন মস্ত যোদ্ধা। এজন্য তাঁকে মহান চার্লস বলা হয়ে থাকে। অবশ্য তাঁর আরও অনেক গুণ ছিল। সে যা-ই হোক, শার্লেমেন মোট ৫৪ বার যুদ্ধ-যাত্রা করেছিলেন। অধিকাংশ জার্মান জাতির ওপর তাঁর প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। তিনি স্পেন ও ইটালীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর সব থেকে বড় কীর্তি হল, দুর্দান্ত স্যাক্সনদের দমন করা। বর্তমান ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানীর বড় অংশ, ইটালীর প্রায় অর্ধাংশ, কর্সিকা দ্বীপ ও স্পেনের কিছু অংশ শার্লেমেনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এই সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন।

শাসনঃ শার্লেমেন সুশাসক ছিলেন। কাউন্ট, ডিউক, মিসি ডোমিনিসি প্রভৃতি কর্মচারীদের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্য শাসন করতেন। তিনি 'ক্যাপিচুলারিজ' নামে বেশ কিছু আইনও প্রণয়ন করেন। শার্লেমেন বহু পথঘাট নির্মাণ করান এবং কৃষি, সেচ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। শার্লেমেন ছিলেন গোঁড়া খ্রীষ্টান। তিনি পরাজিত স্যাক্সন ও অন্যান্য জাতিগুলিকে জোর করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

চেহারা ও চরিত্রঃ তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে শার্লেমেন ভদ্রলোক দেখতে কেমন ছিলেন! ভদ্রলোক লম্বায় ছিলেন প্রায় সাত-ফুটের (২ মিটারের কিছু বেশী) কাছাকাছি। চেহারা বেশ শক্ত সমর্থ হলেও গলার স্বর একটু সরুই। নাকটি বেশ লম্বা, চোখ দুটি ঝকঝকে, মুখটি বেশ হাসিখুসী আর পেটটি ঠিক গণেশ ঠাকুরের মত। মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরতার প্রমাণ দিলেও তিনি ছিলেন রসিক, উদার, দয়ালু ও জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক।

গীর্জা ও সাম্রাজ্য ঃ খ্রীষ্টান গীর্জার সহিত শার্লেমেনের সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শার্লেমেন নিজেকে গীর্জা ও সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলে মনে করতেন। পোপ থেকে যাজক পর্যন্ত সকলকেই তাঁর নির্দেশ ও আইন মেনে চলতে হত। শার্লেমেন যাজকদের বিভিন্ন রাজপদে নিযুক্ত করতেন। তাঁর কাছ থেকে যাজকরা দান হিসাবে প্রচুর জমি পেয়েছিলেন।

শার্লেমেনের রাজসভা ঃ শার্লেমেন নিজে বেশী লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু নানা বিষয় জানার জন্য তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর রাজসভায় দেশ-বিদেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীদের জড় করেন। তাঁর প্রাসাদে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এতে ধনী ও গরীবের ছেলেরা সরকারী ব্যয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেত। সম্রাটের সভাসদরা এখানে শিক্ষকতা করতেন। সভাসদদের মধ্যে ইংরেজ পণ্ডিত অ্যালকুইন, ফ্রাঙ্কজাতীয় লেখক আইনহার্ড, লম্বার্ড ঐতিহাসিক পল, ভিসিগথ কবি থিওডালফ, ইটালীর ব্যাকরণবিদ পিটার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অ্যালকুইন ছিলেন মহাপণ্ডিত ও জনপ্রিয় শিক্ষক। তিনি ছাত্রদের জন্য নানা বিষয়ে বহু বই লিখেছিলেন। কবিতা, ধর্মতত্ব প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ আছে। শার্লেমেনের একটি সুন্দর জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন আইনহার্ড। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক। পল লম্বার্ড জাতির একটি চমৎকার ইতিহাস রচনা করেন। তিনি ব্যাকরণবিদও ছিলেন। থিওডালফ ছিলেন সে যুগের ল্যাটিন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি।

শার্লেমেনের উৎসাহে সাম্রাজ্যের গীর্জা ও মঠগুলিতে বিদ্যালয় খোলা হয়। যাজক সন্ন্যাসীরা গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় রচিত মূল্যবান গ্রন্থগুলি নকল করে রাখেন। মূল্যবান পুঁথিগুলির শুদ্ধ সংস্করণও প্রকাশ করা হতে থাকে। ছোট ছোট সুন্দর অক্ষরে পুঁথি-পুস্তক নকল করা হত। শার্লেমেন ও তাঁর সভাসদদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে নূতন করে বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। একে

বলা হয় ক্যারোলিঞ্জিয় নবজাগরণ। শার্লেমেনের বংশকে ক্যারোলিঞ্জিয় বংশ বলা হত। শার্লেমেনের সময় বহু ল্যাটিন কবিতা সঙ্কলিত হয়। জার্মান ভাষায় রচিত বীরবৃন্দের কীর্তি-গাথাগুলিও সযত্নে লিখে রাখা হয়েছিল।

নির্মাতা হিসাবেও শার্লেমেন-এর কৃতিত্ব কম নয়। তিনি তাঁর রাজধানী আকেন নগরীতে এক বিরাট গীর্জা ও চমৎকার প্রাসাদ নির্মাণ করান। তাঁর উদ্যোগে সাম্রাজ্যে নানা স্থানে প্রাসাদ, মঠ ও গীর্জা নির্মিত হয়েছিল।

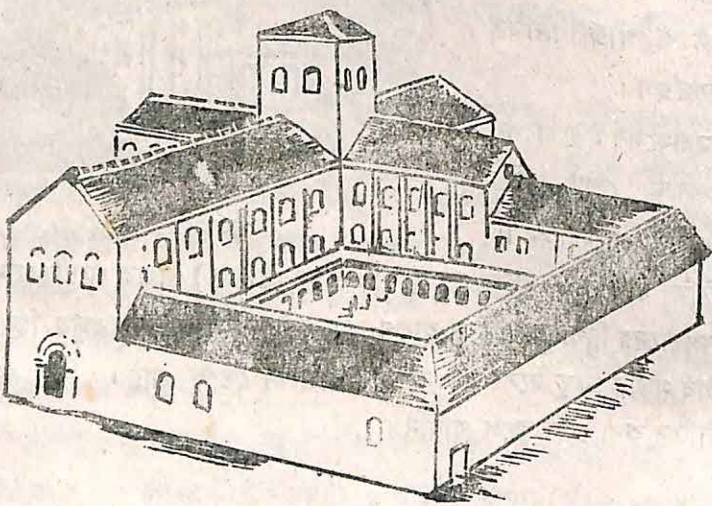


গীর্জা

মধ্যযুগের ইউরোপের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন শার্লেমেন। তিনি দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে (৭৬৮-৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করেছিলেন। বাগদাদের বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অল রশীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তাঁর কীর্তির কথা কেউ ভুলে যায়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মঠ ও সন্ন্যাসীদের কাহিনী

তোমাদের আগে বলেছি, মধ্যযুগের লোকেরা ধর্মের উপর বড় বেশী গুরুত্ব দিত। প্রথম দিকে খ্রীষ্টান ধর্ম ও গীর্জা ধর্মপ্রাণ লোকদের মনে শান্তি দিতে পেরেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম জনপ্রিয় হবার সঙ্গে সঙ্গে এতে নানা জটিলতা ও দুর্নীতি প্রবেশ করে। এতে বিরক্ত হয়ে অনেক সৎ খ্রীষ্টান বন-জঙ্গল বা পাহাড়-পর্বতে গিয়ে তপস্যায় নিযুক্ত হন। কুশাসন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুঠপাট প্রভৃতির ফলেও অনেকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করতে থাকে। তারাও দলে দলে নির্জন স্থানে গিয়ে নিজেদের মুক্তির জন্য সাধন-ভজনে মন দেয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ইউরোপে সন্ন্যাসীদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের সন্ন্যাসীদের "মঙ্ক" ও সন্ন্যাসিনীদের "নান" বলা হত।



মঠ

ইউরোপের সন্ন্যাসীরা প্রথম দিকে একা একা সাধন ভজন করলেও শেষ পর্যন্ত অনেকে মিলে এক জায়গায় বাস করতে থাকেন। তাঁদের এই বাসস্থানকে বলা হত মঠ। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা পৃথক পৃথক

মঠে বাস করতেন। সন্ন্যাসীদের মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত অ্যাবট। সন্ন্যাসিনীদের অধ্যক্ষা ছিলেন অ্যাবেস।

প্রথমদিকে বিভিন্ন মঠ বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলত। ফলে কোথাও বা ছিল খুব কঠোর নিয়ম, কোথাও আবার কোন নিয়মই ছিল না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যে সেণ্ট বেসিল



সেণ্ট বেনিডিক্ট

কতকগুলি নিয়ম প্রচলন করেন। পশ্চিম ইউরোপে চালু হয় সেণ্ট বেনিডিক্ট-এর (আনুমানিক ৪৮০-৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) নিয়ম-কানুন। পূর্বে অনেক সন্ন্যাসী শরীরকে নানারূপ কষ্ট দেওয়াকে তপস্যার অঙ্গ বলে মনে করতেন। সেণ্ট বেনিডিক্ট এর তীব্র নিন্দা করেন। ভারতের

বুদ্ধদেব তাঁর বহু আগেই শরীরকে অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়ার নিন্দা করেছিলেন। ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেনিডিক্ট ঘোষণা করেন যে, (১) কোন মঠের সন্ন্যাসীদের সেই মঠেই মৃত্যু পর্যন্ত বাস করতে হবে। (২) সকল সন্ন্যাসী বাধ্য ও বিনীত হবেন। (৩) সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে বসে দিনে সাতবার ঈশ্বরের স্তবগান করবেন। (৪) তাঁদের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। (৫) তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জিনিসপত্র নিজেরাই তৈরী করে নেবেন। এজন্য প্রতিটি মঠে চাষবাসের জমি, পুকুর, বাগান, শস্য পেষাই-এর যন্ত্র প্রভৃতি রাখা হত। (৬) সন্ন্যাসীদের আহার ও পোষাক হবে সাদামাটা। (৭) তাঁরা নিয়মিত ভাবে পড়াশোনা করবেন, অনাথ-আতুরদের সেবা করবেন এবং অতিথিদের আশ্রয় দেবেন। সন্ন্যাসীদের শিক্ষাদান ও পুঁথি নকল করার কাজও করতে হবে।

চারিদিকে যখন অরাজকতা চলছে তখন কেবল মঠগুলির বাসিন্দারাই শান্ত ও ভদ্র জীবনযাপন করার সুযোগ পেতেন। প্রতিটি মঠেই প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত পুঁথিসমূহ সংগ্রহ ও নকল করা হত। একাজ না হলে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ একেবারেই হারিয়ে যেত। মঠগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা বিস্তারেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। চাষবাস, বাড়ি-ঘর মির্মাণ, চিকিৎসা-বিদ্যা বিভিন্ন কারুশিল্প প্রভৃতি ব্যাপারেও জন-সাধারণ সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করে। সন্ন্যাসীরা



সন্ন্যাসীরা খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করছেন

শীঘ্রই বিলাস-ব্যসনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। অনেকে বিবাহ করে সাধারণ লোকের মতই জীবন কাটাতে শুরু করেছিলেন।

নবম শতকে উত্তর ইউরোপ থেকে এক দুর্ধর্ষ জাতি পশ্চিম ইউরোপের এক বিরাট অঞ্চলে হানা দেয়। এদের নাম নর্থমেন বা ভাইকিং। তাদের অত্যাচার ও লুঠপাট থেকে মঠগুলিও রেহাই পায়নি। এই অন্ধকার যুগে মঠগুলি শক্তিশালী জমিদার বা সামন্তদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। শীঘ্রই মঠ ও মঠের সম্পত্তি সামন্তদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। মঠের অধ্যক্ষের পদ ও বিষয়সম্পত্তিও কেনা-বেচা শুরু হল। গীর্জাগুলিতেও একই ধরনের অব্যবস্থা দেখা দিল। মঠের অ্যাবটকে সন্ন্যাসীরা নির্বাচন করতেন। গীর্জার বিশপগণ (উচ্চ শ্রেণীর যাজক) নির্বাচিত হতেন পুরোহিতদের দ্বারা। রাজা ও সামন্তগণ এই নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে নিজেদের লোককে নির্বাচিত করাতেন। অ্যাবট ও বিশপকে সম্পত্তির অধিকারী বলে তাঁদের প্রভু সামন্ত বা রাজার কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে হত।

ক্লুনী : শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। এই ব্যাপারে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ফ্রান্সের বার্গাণ্ডীতে অবস্থিত ক্লুনীর মঠ। এটি ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লুনীতে স্থাপিত হয়েছিল। এই মঠটি সেণ্ট বেনিডিক্ট-এর নিয়মকানুনগুলি কঠোরভাবে পালন করতে থকে। ক্লুনীর মঠ সন্ন্যাসী ও যাজকদের অবিবাহিত থাকতে নির্দেশ দেয়। এটি দাবী করে যে, অ্যাবট ও বিশপদের নির্বাচনে সামন্ত, রাজা প্রভৃতি বিষয়ী লোকদের কোন হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না। সন্ন্যাসী বা যাজকগণ প্রার্থনাতেই বেশী সময় কাটাবেন, দৈহিক পরিশ্রম তেমন না করলেও চলবে। ক্লুনী মঠের এই সংস্কার শীঘ্রই খুব জনপ্রিয় হয়। বহু মঠ ক্লুনীর অ্যাবটের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হল। পোপগণও ক্লুনীর সংস্কার আন্দোলনকে সমর্থন করায় এটি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ফলে মঠ ও গীর্জাগুলি দুর্নীতিমুক্ত হয় এবং সেগুলির ওপর বিষয়ী লোকেদের প্রভাব কমে যেতে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইন্‌ভেষ্টিচার বা পদে প্রতিষ্ঠিত করা নিয়ে বিবাদ

ক্লুনী মঠের সংস্কার-অন্দোলনের ফলে যাজকগণ সাহসী হয়ে ওঠেন। পোপগণও এই সুযোগে সামন্ত ও রাজাদের প্রভাব থেকে গীর্জা ও মঠগুলিকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। এটি করতে পারলে গীর্জা ও মঠগুলির ওপর পোপের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা যাবে।

অ্যাবট ও বিশপগণ নির্বাচিত হবার পর সামন্ত, রাজা বা সম্রাটের কাছ থেকে একটি আংটি ও দণ্ড গ্রহণ করতেন। আংটি হল অ্যাবট বা বিশপের অধীনস্থ এলাকার প্রতীক। তাঁদের ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষমতার প্রতীক ছিল দণ্ড। এ দুটি গ্রহণ করে তাঁরা তাঁদের পদে আনুষ্ঠানিক ভাবে অধিষ্ঠিত হতেন। একে বলা হত 'লে ইনভেষ্টিচার'। এর অর্থ, বিষয়ী লোক দিয়ে যাজকদের পদে অধিষ্ঠিত করণ। পোপ সপ্তম গ্রেগরী (১০৭৩-১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) লে ইন্‌ভেষ্টিচার'-কে বেআইনী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু সামন্ত ও শাসকবর্গ তার নির্দেশ মেনে নিতে পারলেন না। কারণ অ্যাবট এবং বিশপগণ বিশাল ভূ-সম্পত্তি ভোগ করতেন। প্রতীক চিহ্ন দুটি সামন্ত বা রাজার কাছ থেকে গ্রহণ করে অ্যাবট এবং বিশপগণ প্রজা হিসাবে তাঁদের প্রতি আনুগত্য দেখাতেন। এই আনুগত্যের অবসান ঘটালে রাজ্যের এক বিশাল অংশ কার্যতঃ স্বাধীন হয়ে যেত। কোন শাসক এটি সহ্য করতে পারেন না। তা ছাড়া গীর্জার ভূ-সম্পত্তি থেকে সামন্ত বা রাজার ভালরকম আয়ও হত। সেটিও সহজে ছাড়া যায় না।

এই নিয়েই পোপের সঙ্গে পবিত্র রোমান সম্রাট চতুর্থ হেনরীর (১০৫৭-১১০৬খ্রীঃ) ঘোর বিবাদ বাধে। ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হেনরী ক্যানোসা নামক স্থানে পোপের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি পোপের নির্দেশ অমান্য করে লে ইন্‌ভেষ্টিচার শুরু করে দেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে তা' চলতে থাকে। ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ হেনরীর পুত্র পঞ্চম হেনরীর

আমলে ওয়র্মস্ নামক স্থানে স্বাক্ষরিত এক সন্ধির দ্বারা এই বিরোধের অবসান ঘটে। এটি কন্‌করডাট অব ওয়র্মস্ নামে খ্যাত। এর দ্বারা ঠিক হয় যে, কেবল পোপ বা তাঁর প্রতিনিধিই বিশপদের প্রতীক চিহ্ন দুটি দিয়ে পদে অধিষ্ঠিত করবেন। তবে বিশপগণ জমি ভোগ করেন বলে সামন্ত বা রাজার কাছে আনুগত্যের শপথও নেবেন। এইভাবে উভয় পক্ষই মোটামুটি সন্তুষ্ট হল।

ইন্‌ভেষ্টিচার বিবাদের মূল কারণ কিন্তু আংটি ও দণ্ড প্রদান করার অধিকার কার, তা' নিয়ে নয়। আসলে পোপ বড় না সম্রাট বড়—এই প্রশ্নই এই বিবাদের মূলে ছিল। প্রত্যেকে নিজেকে সর্বেসর্বা বলে দাবী করেছিলেন। এই দাবীর মীমাংসা ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে হয়নি, হয়েছিল অনেক পরে। শেষ পর্যন্ত পোপই সর্বেসর্বা বলে প্রমাণিত হয়েছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্য যুগের ইউরোপে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল। এগুলির মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছিল গীর্জা ও বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি বৃহৎ বিদ্যালয় ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে দেশ বিদেশ থেকে বহু ছাত্র পড়াশোনো করতে আসত। বিখ্যাত অধ্যাপকগণ তাদের শিক্ষার ভার নিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পাঠ শেষে ছাত্ররা বি. এ., এম. এ. প্রভৃতি ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষকতা বা নানা ধরনের কাজে নিযুক্ত হত। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের নানা স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে ওঠে।

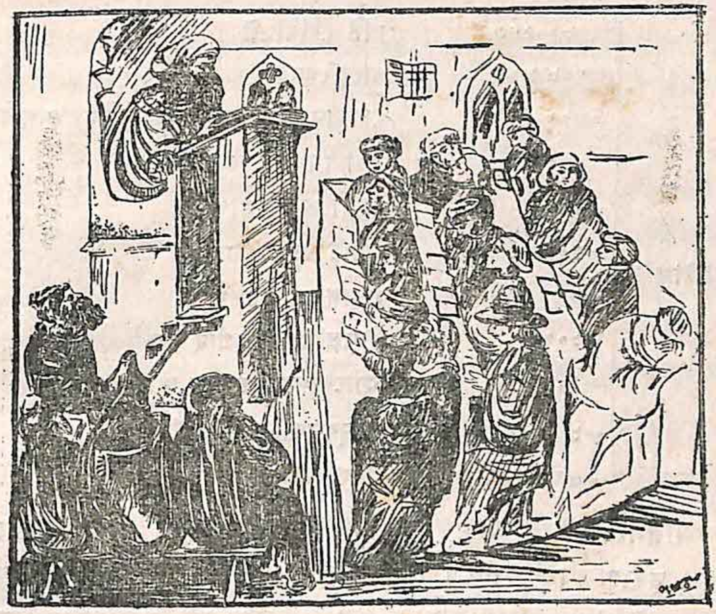
তোমাদের আগে বলেছি, মঠ ও গীর্জাগুলিতে বিদ্যালয় খুলে ছাত্র-দের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সব বিদ্যালয়ে খুব বেশী ছাত্রের পড়াশোনার সুযোগ ছিল না। একাদশ-দ্বাদশ শতকে শিক্ষা-দীক্ষা লাভের জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা দেয়। পোড়াশোনা করে ডিগ্রী পেলে গীর্জায়, সামন্ত, রাজা বা সম্রাটের অধীনে কাজ পাওয়ার যথেষ্ট

সুযোগ ছিল। শহরগুলিতেও শিক্ষিত লোকের কম চাহিদা ছিল না। জীবিকার প্রয়োজনেই ছাত্রেরা শিক্ষালাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ঠিক এরকম আগ্রহই দেখা গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে ইংরেজী শেখার জন্য। পুরোন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বেশী ছাত্র ধরত না বলে নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। শীঘ্রই এদের আকার বিশাল হয়। এগুলিই বিশ্ববিদ্যালয় বলে খ্যাত হয়। ফ্রান্সের প্যারিস নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়, ইটালীর স্যালার্নো ও বলোনা, ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ, জার্মানীর লাইপজিগ ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল। ধর্ম-শাস্ত্রের চর্চার জন্য প্যারিস, চিকিৎসা-বিদ্যার কেন্দ্ররূপে স্যালার্নো এবং আইন চর্চার জন্য বলোনার খ্যাতি ছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপে অন্ততঃ ৮০টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির প্রধান আকর্ষণ ছিলেন সুপণ্ডিত অধ্যাপকগণ। এঁদের মধ্যে সুবিখ্যাত ছিলেন পিটার অ্যাবেলার্ড, আরনেরিয়াস, অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস, টমাস অ্যাকুইনাস প্রভৃতি। পিটার অ্যাবেলার্ড প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর মত জনপ্রিয় অধ্যাপক আর জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। কোন বিষয় নিয়ে তর্ক করতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর মতে বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তি অনেক বড়। তাঁর দুই শিষ্য আর্ণল্ড ও পিটার লম্বার্ডও পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। আর-নেরিয়াস বলোনায় রোমান আইন পড়াতেন। মহাপণ্ডিত অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল-এর দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল টমাস অ্যাকুইনাসের। তিনি ছিলেন অ্যালবার্টাস-এর ছাত্র। তিনি খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বেশ ভালই ছিল। তবে অধ্যাপকরা বেশী ছুটিছাটা নিলে বা মনোযোগ দিয়ে না পড়ালে ছাত্ররা রেগে যেত। অধ্যাপকগণ পাঠ্য বই-এর মূল কথা ক্লাশে দ্রুত বলে যেতেন। ছাত্ররা তা' হয় লিখে নিত, না হয় মনে গেঁথে রাখত। পরীক্ষার

পর ছাত্ররা অধ্যাপকদের খানা-পিনার ব্যবস্থা করত। উদ্দেশ্য, তাঁদের খুশী করে পাসের নম্বর আদায় করা। ফেলকরা ছাত্ররা কখনো



বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ

কখনো অধ্যাপকদের ওপর হামলা করত বলে জানা যায়। চার-পাঁচ বছর ধরে পড়াশোনা করার পর ছাত্ররা বি. এ. ডিগ্রী লাভ করত। বেশীর ভাগ ছাত্রই খুব দুর্দান্ত ছিল। তারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বা শহরের লোকজনের সঙ্গে মারামারি বাধাত।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, ব্যাকরণ, ছন্দ, তর্কশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিবিদ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। কোথাও কোথাও আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতিও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের স্মৃতি-শক্তি বৃদ্ধি করত, তাদের স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শেখাত এবং তর্কবিতর্কে দক্ষ করে তুলত।

মধ্যযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না ॥

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ

৪৮০-৫৪৩	সেন্টি বেনিডিক্ট
৭৬৮-৮১৪	শার্লেমেন
৮০০	রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
৯১০	ক্লুনীতে মঠ স্থাপন
১০৫৬-১১০৬	সম্রাট চতুর্থ হেনরী
১০৭৩-১০৮৫	পোপ সপ্তম গ্রেগরী
১০৭৬	ইন্‌ভেষ্টিচার সংগ্রাম শুরু
১০৭৭	ক্যানোসায় সম্রাটের আত্মসমর্পণ
১১২২	কন্‌কর্‌ডাট অব ওয়র্মস্‌
একাদশ-দ্বাদশ শতক	বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা

সারসংক্ষেপ ● ফ্রাঙ্ক জাতির শক্তিশালী রাজা শার্লেমেন ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় লিও কর্তৃক রোমান সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল বলে মনে করা হয়। এই সাম্রাজ্য পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত। শার্লেমেনের অভিষেক মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা। শার্লেমেন দিগ্বিজয়ী, সুশাসক ও বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

দুর্নীতিগ্রস্ত গীর্জা ও যাজকদের কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে অনেক খ্রীষ্টান বনে-জঙ্গলে বা নির্জন স্থানে একা একা বা দলবদ্ধভাবে বাস করতে থাকেন। তাঁরা নিজেদের মুক্তি লাভের জন্য তপস্যায় নিযুক্ত থাকতেন।

এঁদের বলা হত মঙ্ক বা সন্ন্যাসী। তাঁদের বাসস্থানের নাম মঠ। এরা কঠোর নিয়ম কানুন মেনে চলতেন। তাঁরা নিজেরা লেখাপড়ার চর্চা করতেন ও ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। মঠ ও গীর্জাগুলিকে দুর্নীতি মুক্ত-করার জন্য ক্লুনীর মঠ এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের ফলে মঠ ও গীর্জাগুলি খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যাজক ও পোপগণ সামন্ত ও রাজাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে চাইলে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ শুরু হয়। এর নাম ইনভেষ্টিচার বিবাদ।

একাদশ-দ্বাদশ শতকে জনগণ নানাবিদ্যা শেখার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠ্‌লে বড় বড় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলিতে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। দেশ বিদেশ থেকে বহু ছাত্র ও অধ্যাপক এগুলিতে যোগ দিতেন। মধ্যযুগের ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞানের আলো বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

অনুশীলনী

১। শার্লেমেন কোন্ জাতির রাজা ছিলেন? কত খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোমান সম্রাটের পদ লাভ করেন? তাঁকে সম্রাটের মুকুট কে দিয়েছিলেন? তাঁর অভিষেকের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২। শার্লেমেনের সহিত খ্রীষ্টান গীর্জার কেমন সম্পর্ক ছিল?

৩। শার্লেমেনের রাজসভায় কোন্ ধরনের লোক থাকতেন? তাঁদের কয়েকজনের নাম কর। শার্লেমেনের প্রাসাদে যে বিদ্যালয় ছিল সে সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। ৪। শর্লেমেন শিল্প ও সাহিত্যের জন্য কি করেছিলেন?

৫। মঠ বলতে কি বোঝ? মঠে সন্ন্যাসীরা কিরূপ জীবন যাপন করতেন?

৬। সেণ্ট বেনিডিক্ট-এর নিয়ম কানুন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

৭। পুঁথি পুস্তক সংরক্ষণ ও শিক্ষা বিস্তারে মঠগুলির কি ভূমিকা ছিল?

৮। ক্লুনীর মঠের সংস্কার সম্পর্কে কি জান?

৯। ইন্‌ভেষ্টিচার বিবাদ সম্বন্ধে কি জান? আংটি ও দণ্ড কিসের প্রতীক?

১০। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কি বোঝ? কি কি কারণে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে?

১১। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্ক কেমন ছিল?

১২। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপকদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

১৩। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কি কি বিষয় পড়ান হত?

১৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—

(ক) পোপ—লিও—রোমান সম্রাটের মুকুট প্রদান করেন।

(খ) —খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র—সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(গ) শার্লেমেনের জীবনী রচনা করেছিলেন—।

(ঘ) অ্যালকুইন ছিলেন—।

(ঙ) কন্‌কর্‌ডাট অব ওয়র্ম্‌স্ স্বাক্ষরিত হয়—খ্রীষ্টাব্দে।

(চ) চিকিৎসাবিদ্যার কেন্দ্র ছিল—বিশ্ববিদ্যালয় এবং—জন্য বলোনার খুব খ্যাতি ছিল।

১৫। ভুল সংশোধন কর:—

(ক) শার্লেমেনের হাত থেকে পোপ লিও মুকুট গ্রহণ করেন।

(খ) ক্লুনী মঠের সংস্কার আন্দোলন বিষয়ী লোকেদের হাত থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকে মুক্ত করতে চেয়েছিল।

(গ) ইন্‌ভেষ্টিচার বিবাদের মূল কারণ হল, কে অ্যাবট ও বিশপদের প্রতীক চিহ্ন দিয়ে পদে অধিষ্ঠিত করবে—সে নিয়ে দ্বন্দ্ব।

১৬। টীকা লেখ:—

(ক) অ্যালকুইন (খ) পিটার অ্যাবেলার্ড (গ) টমাস অ্যাকুইনাস।

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ত প্রথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সামন্ত প্রথা ● সম্পর্কের ভিত্তি জমি ● সামন্ততন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ ● বেসরকারী ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ ● ইউরোপের রক্ষা কার্যে দুর্গ ও বর্মাবৃত অশ্বারোহীর ভূমিকা ● সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা ● শিভাল্‌রী বা বীরধর্ম ● ট্রুব্যাডুর বা গায়কবৃন্দ ● ম্যানর ব্যবস্থা ● জমিদার ও সার্ফদের অবস্থা ● সার্ফদের মুক্তির উপায়।

সামন্ত প্রথা নিয়ে আগে দু'চার কথা বলেছি। এখন এ ব্যাপারে একটু বিস্তারিত ভাবে বলব। রাজা বা সম্রাট যখন দুর্বল হয়ে পড়েন, প্রজাদের রক্ষা করার মত ক্ষমতা যখন তাঁদের হাতে থাকে না তখনই সামন্ত প্রথার উদ্ভব হল। দুর্বল লোকেরা নিজেদের ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্য ছোট-বড় জমিদারের আশ্রয়ে যায়। জমিদারগণ তাদের বসবাস ও চাষবাসের জন্য জায়গা দেয় এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লয়। বিনিময়ে তাদের প্রজারা তাদের হয়ে যুদ্ধ করতে, তাদের সেবা করতে ও কর দিতে রাজী হল। প্রজারা আরও কথা দিল, তারা সব সময় জমিদারদের অনুগত থাকবে। এই জমিদারগণ আবার তাদের চেয়েও বড় জমিদারদের আশ্রয় নেয়। এইভাবে সব থেকে বড় জমিদাররা আশ্রয় নিল স্বয়ং রাজা বা সম্রাটের অধীনে। এই ভাবেই গড়ে উঠল সামন্ত ব্যবস্থা। সামন্ত প্রথার অন্য একটি দিকও আছে। আইনতঃ রাজা বা সম্রাট রাজ্যের সমস্ত জমির মালিক। তিনিই বড় জমিদার বা সামন্তদের মধ্যে জমি ভাগ করে দেন। তারা আবার জমি ভাগ করে দেয় তাদের চেয়ে ছোট জমিদারদের মধ্যে। এরা কেউই নিজেরা জমি চাষ করে না। এই জমিদাররাও জমি ভাগ করে দিতে থাকে অন্যদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত সবার নীচে যারা থাকে সেই চাষীরাই জমি চাষ করতে বাধ্য হয়। এদের নাম সার্ফ বা ভিলেন।

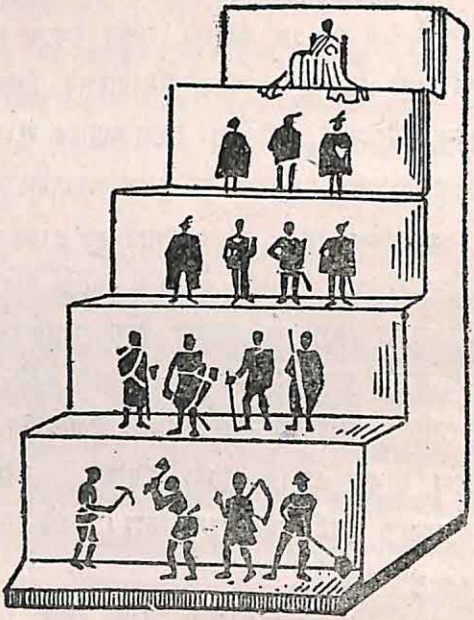
সংক্ষেপে এই হল সামন্ত প্রথা। জমির মালিককে বলা হত লর্ড। তার কাছ থেকে যারা জমি বা জায়গীর নিত তাদের নাম ভ্যাসাল। জায়গীরকে বলা হত 'ফিউড'। ফিউড থেকেই ফিউড্যালিজম বা 'সামন্ত প্রথা' কথাটি এসেছে।

শার্লেমেনের মৃত্যুর (৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ) পর থেকে ক্যারোলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। এ সময় ইউরোপের উত্তরাঞ্চল থেকে নর্থমেনরা পশ্চিম ইউরোপে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবাধে লুঠপাট চালাতে থাকে। এরা ছিল জলদস্যু। দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ চালাতে থাকে মুসলমানগণ। অনেকের ধারণা, এসকল আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যই জনসাধারণ শক্তিশালী জমিদারদের আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। রাজা বা সম্রাটের সাধ্য ছিল না তাদের রক্ষা করার। এর ফলেই পশ্চিম ইউরোপে সামন্ত প্রথা চালু হয়। এটি চলে খ্রীষ্টীয় নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত। আসলে কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগ থেকেই ইউরোপে সামন্ত প্রথার সূচনা হয়েছিল। সামন্ত ব্যবস্থার আদি রূপটি রোমান ও জার্মানদের জানা ছিল। এই ব্যবস্থার ওপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবও খুব কম ছিল না।

জমির গুরুত্ব ঃ উপরের আলোচনা থেকে একটা জিনিষ বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সেটি হল সামন্ত ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি জমি। এই জমিকে কেন্দ্র করেই মানুষে মানুষে সম্পর্কে গড়ে ওঠে। প্রজা জমিদারের কাছ থেকে কতকগুলি শর্ত মেনে জমি নেয়। উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। যতক্ষণ প্রজা চুক্তির শর্তগুলি মেনে চলে, জমিদার প্রজাকে জমি থেকে উৎখাত করে না। প্রজা বংশানুক্রমিক ভাবে জমিতে বসবাস ও চাষবাসের অধিকার লাভ করে। বার বার বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় চাষবাসই জীবন ধারণের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে জমিকে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগের জীবনধারা বিকশিত হয়।

বিভিন্ন শ্রেণী ঃ সামন্ত ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণী দেখা যায়। সবার ওপরে রাজা। তাঁর নীচে ডিউক, মার্কুইস, কাউন্ট বা আর্ল। তাদের

নীচে ব্যারন, ব্যারনদের নীচে নাইট এবং সবার নীচে স্বাধীন প্রজা ভিলেন ও সার্ফ। স্বাধীন প্রজারা জমিদারকে খাজনা দিয়ে জমি ভোগদখল করত। তারা ইচ্ছা করলে জমি ছেড়ে চলে যেতে পারত।



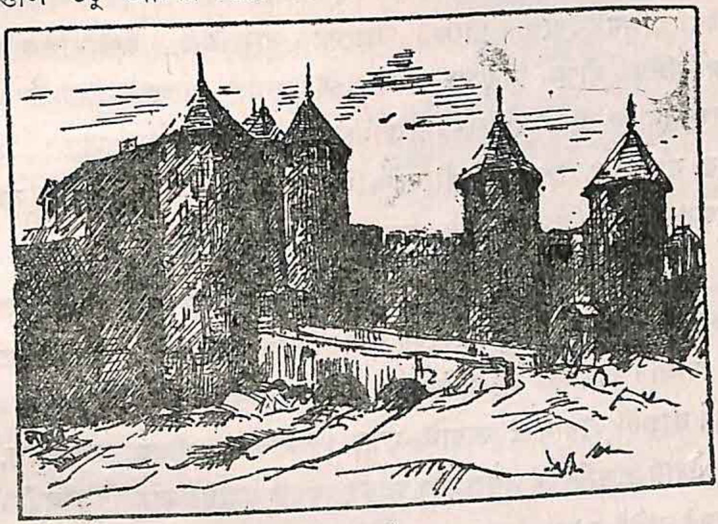
সামন্ত ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাগ :
১। রাজা বা সম্রাট ২। ডিউক প্রভৃতি ৩। ব্যারন
৪। নাইট ৫। স্বাধীন প্রজা, ভিলেন ও সার্ফ

তাদের পরেই ভিলেনদের স্থান। তারা জমিদারের সম্মতি না নিয়ে জমি ছেড়ে চলে যেতে পারত না। তবে জমির সঙ্গে তাদের বিক্রী করে দেওয়া যেত না। সার্ফদের অবস্থা ছিল সবার থেকে খারাপ। তারা ছিল জমির সঙ্গে বাঁধা। জমিদারদের সেবাই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

সামন্তদের ক্ষমতা : সামন্ত ব্যবস্থায় সামন্ত বা জমিদারগণ রাজা বা সম্রাটের বহু ক্ষমতায় ভাগ বসায়। তারা একাধারে শাসক, বিচারক, আইনপ্রণেতা ও পুলিশের হর্তাকর্তা। গীর্জা ও মঠের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও নিত তারা। জনগণকে চোর-ডাকাত-এর হাত থেকে রক্ষা

করেই তারা ক্ষান্ত থাকত না। বিদেশী আক্রমণ থেকেও তারা জনগণকে রক্ষা করত। নিজেদের টাঁকশালে মুদ্রা প্রস্তুত করতেও তারা দ্বিধা করত না। সংক্ষেপে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বদলে রাজ্যের নানা স্থানে প্রায় স্বাধীন আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা চালু হল। পাথরে তৈরী দুর্গগুলি ছিল সামন্তদের শক্তির কেন্দ্র। তারা ইচ্ছামত একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, লুঠপাট চালাত এবং প্রজাদের শোষণ করে ভোগবিলাসে গা ঢেলে দিত।

দুর্গ: সামন্তদের দুর্গগুলি ছিল দুর্গম পাহাড় বা টিলার চূড়ায়। এগুলি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের পর পরিখা বা খাত,



দুর্গ

সাধারণতঃ এটি ছিল জলে ভরা। পরিখার ওপর সেতু। সেটিকে দরকারমত টেনে দুর্গের মধ্যে তুলে রাখা যেত। দুর্গের প্রধান ফটক পেরিয়ে চত্বর। তারপর আবার ফটক। ফটক পেরিয়ে সামন্তের বাসগৃহ। এটিরও চারিদিকে শক্ত উঁচু দেয়াল। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই ব্যবস্থা। জমিদারের প্রজারা দুর্গের কাছেই বাস করত। বিপদের সময় মেয়ে ও শিশুরা আশ্রয় নিত দুর্গের ভেতরে। উত্তর দিক থেকে আসা নর্থমেন, দক্ষিণ দিকের মুসলমান এবং পূর্ব দিকের হাঙ্গেরীয় আক্রমণকারীদের হাত থেকে ইউরোপকে

রক্ষা করেছিল সামন্তগণ। এ ব্যাপারে তাদের প্রধান সহায় ছিল দুটি —(১) সুরক্ষিত দুর্গ এবং (২) বর্মে ঢাকা অশ্ব ও অশ্বারোহী সৈন্য। আক্রমণকারীরা সহজে এই দুর্গগুলি দখল করতে পারত না। বর্মে ঢাকা অশ্ব ও অশ্বারোহীদের আহত বা নিহত করাও ছিল বেশ কঠিন।

সামন্তযুগের জীবন ধারা : সামন্তব্যবস্থার ফলে ইউরোপে এক বিশিষ্ট জীবনধারা গড়ে ওঠে। এ জীবন রুক্ষ, কঠোর, অশান্ত ও নিরানন্দ। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মোকবিলা করার জন্য এর সৃষ্টি। ধনপ্রাণ বাঁচাবার তাগিদে মানুষ নিজের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে শক্তিশালী জমিদারের সেবক হয় এবং তাঁর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করত এই সামন্ত ব্যবস্থা। যার জমি আছে সমাজে তারই প্রতিষ্ঠা। জমিহীনরা তাদের সেবক মাত্র। এ সময় সামন্তগণ শুধু বিদেশীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে লিপ্ত থাকত না, নিজেদের মধ্যেও অনবরত যুদ্ধ করত।

শিভাল্‌রী—সামন্তব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শিভাল্‌রী বা বীরধর্ম। নাইটদের কথা আগে বলেছি। তাঁরা ছিল বীর যোদ্ধা। প্রত্যেক বড় জমিদারের অধীনে বেশ কিছু নাইট থাকত। যুদ্ধের কাজটা প্রধানতঃ তারাই করত। নাইটরা বীরত্ব, আনুগত্য, দয়া, ঔদার্য প্রভৃতি যে সকল গুণ আয়ত্ব করত তাদের নাম শিভাল্‌রী। প্রথমেই নাইট হওয়া যেত না। আগে কোন বড় জমিদারের বাড়ীতে থেকে আদেশ পালন, শিকার, যুদ্ধবিদ্যা ও ভদ্র আচরণ শিখে নিতে হত। সাধারণত: জমিদারদের ছেলেরাই এই সুযোগ পেত। অল্প বয়সে শুধু তাদের এটা-ওটা করতে বলা হত। তখন তাদের বলা হত পেজ। একটু বড়সড় হলে শুরু হত ঘোড়ায় চড়া, শিকার ও যুদ্ধ শেখা, তখন তাদের বলা হত স্কোয়ার। স্কোয়ার থেকেই নাইট হওয়ার নিয়ম ছিল। বয়স একুশ-বাইশ হলে স্কোয়ার জমিদারের কাছে নত-জানু হয়ে বসত। জমিদার তখন তরোয়ালের ভোঁতা দিক দিয়ে তাঁর কাঁধে মৃদু আঘাত করতেন এবং তার কোমরে একটি তরোয়াল বেঁধে

দিতেন। এর পরই স্কোয়ারটি নাইট বলে পরিচিত হত। পরবর্তীকালে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে নাইট করার অনুষ্ঠানটি জাঁকাল হয়ে ওঠে। প্রথমে নাইট হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে স্নান করে পবিত্র হতে হত। এর পর তাকে পরিয়ে দেওয়া হত সাদা, লাল ও কালো রঙের পোশাক। তারপর তাকে চব্বিশ ঘণ্টা উপবাসী থেকে রাত জেগে গীর্জার বেদীর ওপর রাখা তরোয়াল পাহারা দিতে হত। পরদিন ভোরে সে তার সব পাপ স্বীকার করে প্রার্থনা সভায় যোগ দিত। সবশেষে বিশপ কিছু কর্ত্তব্য করার জন্য তাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিতেন এবং নতজানু ব্যক্তিটির কোমরে তরোয়ালটি বেঁধে দিতেন। এরপর নাইটটি বর্ম পরে, ঘোড়ায় চড়ে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে তার বীরত্ব দেখাতে।



নাইট

নাইট এই সকল কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল: (১) সে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করবে এবং মেনে চলবে, (২) রাজাকে বিশ্বস্তভাবে সেবা করবে, (৩) দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা করবে, (৪) স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং তাদের বিপদ থেকে বাঁচাবে; (৫) সর্বদা সত্যকথা বলবে, সকলের উপকার করবে এবং অন্যায়, নীচত্ব ও প্রবঞ্চনা বর্জন করবে। সে হবে প্রকৃত সাহসী ও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সতত প্রস্তুত।

সব নাইট অবশ্য এগুলি মেনে চলত না। তাহলেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও শপথের সাহায্যে খ্রীষ্টধর্ম দুর্দান্ত নাইটদের কিছুটা সংযত করতে পেরেছিল। এই শিভাল্‌রীর প্রভাবেই মধ্যযুগের ইউরোপীয়গণ দয়া-দাক্ষিণ্য, নম্রতা, আজ্ঞানুবর্তিতা, ভদ্রতা প্রভৃতি গুণ অর্জন করে।

ট্রুব্যাডুর—স্কোয়ারগণ শুধু শিকার আর যুদ্ধবিদ্যাই শিখত না। গান-বাজনা কাব্যরচনা প্রভৃতিতেও তারা তালিম নিত। একাদশ শতব্দীর শেষদিকে দক্ষিণ ফ্রান্সে একদল কবির আবির্ভাব হয়। এরা ছোট ছোট গীতিকবিতা রচনা করে তাতে সুর দিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গাইত। তারা ট্রুব্যাড়ুর নামে খ্যাত। জমিদারদের সভাগুলিতে এই গায়কদের খুবই আদর ছিল। বীরত্ব, সুন্দরী নারীর প্রশংসা প্রভৃতি ছিল এই সকল কবিতা ও গানের বিষয়বস্তু। শীঘ্রই ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের কবিতা রচিত হতে থাকে। ট্রুব্যাডুরগণ তাদের কবিতাগুলি রচনা করতেন আঞ্চলিক ভাষায়। তার ফলে ইউরোপের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

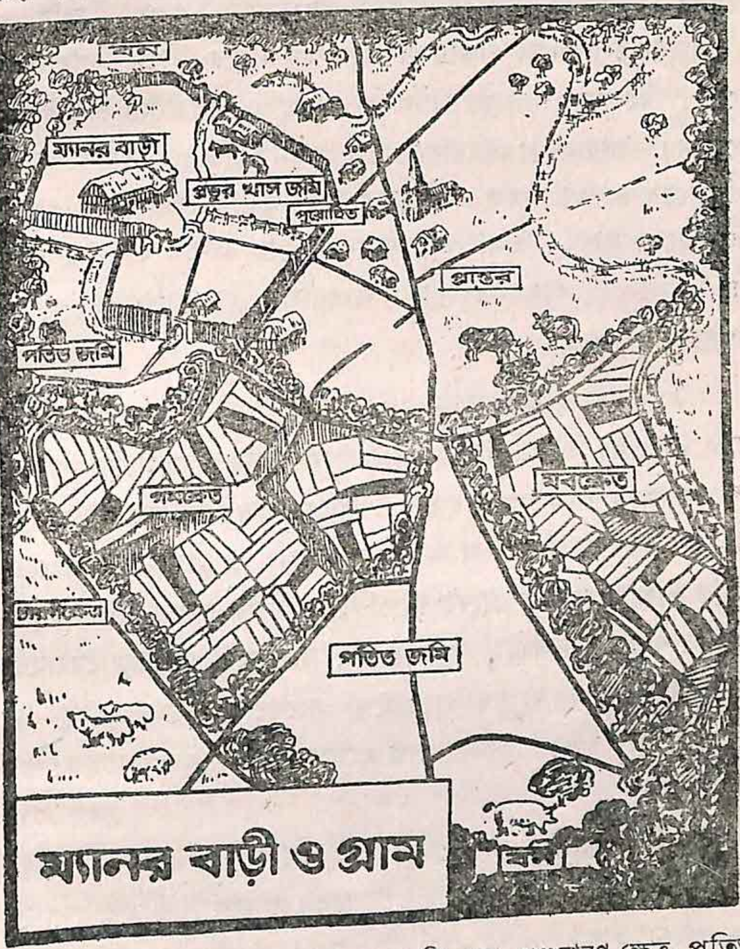


ট্রুব্যাডুর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ম্যানর ব্যবস্থা

মধ্য যুগে ইউরোপের বিশপ ও জমিদারগণ প্রচুর পরিমাণ জমির মালিক ছিলেন। জমিদারগণ তাদের জমির কিছুটা নিজেদের জন্য রেখে বাকী অংশ প্রজাদের মধ্যে ভাগ করে দিত। এভাবে জমিদারদের জমিদারীতে গ্রাম গড়ে উঠত। এই গ্রামকে বলা হত ম্যানর। বড় জমিদারদের অধীনে একাধিক ম্যানর থাকত। গ্রামের সব লোক মিলে ম্যানরের জমি চাষ করত ও ফসল তুলত। কারণ একা একা চাষ করা তখন খুব কঠিন কাজ ছিল। তবে প্রজারা নিজের নিজের জমির ফসল নিজেরাই নিয়ে নিত। এই প্রজাদের কেউ কেউ মোটামুটি স্বাধীন হলেও বেশীর ভাগই জমিদারের কেনা গোলামের মত। এদের বলা হত সার্ফ। এদের কথা তোমাদের আগে বলেছি।

সামন্ত ব্যবস্থার অর্থনীতি কৃষির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ম্যানরগুলিকে সামন্ত ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কেন্দ্র বললে ভুল হবে না। এখানকার প্রধান কাজই ছিল চাষবাস। তবে চাষবাসের পদ্ধতি মোটেই উন্নত ছিল না। ম্যানরগুলি ছিল প্রায় সকল ক্ষেত্রে স্বনির্ভর। ম্যানরের বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই ম্যানরে তৈরী করে



ম্যানর বাড়ী ও গ্রাম

নিত। প্রতিটি ম্যানরে থাকত চাষের জমি, বন, পশুচারণ ক্ষেত্র, পতিত জমি, পুকুর বা খাল, গীর্জা, গম পেষাই-এর কল, কারিগর, ছুতোর, তাঁতী, কামার, বহুলোকের রুটি সেঁকার উপযোগী উনুন, মদ তৈরীর ব্যবস্থা, আদালত প্রভৃতি। মসলা, নুন, লোহা প্রভৃতি অবশ্য বাইরে

থেকে আনতে হত। বাড়তি ফসল কেনা-বেচার জন্য মাঝে মাঝে ম্যানরে বাজার বসত।

ম্যানর-এর মালিক অর্থাৎ জমিদার একটি বড় বাড়ী বা দুর্গে বাস করত। বাড়ীটি ছিল ম্যানরের শাসন কেন্দ্র। ম্যানরকে সামন্ততান্ত্রিক সরকারের আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র বলা যেতে পারে। জমিদারের কর্মচারীরা তার হয়ে ম্যানরের কাজকর্ম দেখাশোনা করত। জমিদার তার বাড়ীর হলঘরে বা গীর্জায় বা কোন বড় গাছের নীচে বিচার সভা বসাত। গ্রামের লোকদের নানা অভিযোগ ও অপরাধের বিচার হত সেখানে। সাধারণতঃ জরিমানাই ছিল প্রধান শাস্তি। জরিমানা থেকে জমিদারের ভাল আয় হত। গ্রামের সবাই এই বিচার সভায় যোগ দিতে বাধ্য ছিল। তারা জমিদারকে বিচার করতে ও শাস্তি দিতে সাহায্য করত। সামন্ত ব্যবস্থায় ম্যানরগুলিই ছিল আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র স্বরূপ।

আগেই বলা হয়েছে, ম্যানরের বাসিন্দা চাষীরা একসঙ্গে মিলে নিজেদের জমিগুলি চাষ করত। জমিদারের নিজস্ব জমিতেও তাদের একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হত। সপ্তাহে তিন দিন তাদের বেগার দিতে হত জমিদারের খাস বা নিজস্ব জমিতে। এ ছাড়াও জমিদারের অন্যান্য কাজ করার জন্য তাদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হত। প্রভুর জন্য জল বওয়া, কাঠ কাটা, মাল বওয়া, রাস্তা-ঘাট ও সেতু মেরামত প্রভৃতি নানা কাজের দায়িত্ব তাদেরই। সংক্ষেপে, তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। জমিদারদের প্রয়োজনে তারা যুদ্ধ করতেও বাধ্য ছিল।

জমিদার চাষীদের কাছ থেকে নানা কর আদায় করত। চাষীরা নগদে বা জিনিসপত্রে এই কর দিত। চাষীদের মাথাপিছু কর, সম্পত্তি কর, প্রধান প্রধান উৎসবে নানা উপহার, উত্তরাধিকার কর, বিবাহ কর প্রভৃতি দিতে হত। এছাড়া জমিদারের যাঁতা, রুটি সেঁকার উনুন, কুয়ো প্রভৃতি ব্যবহারের জন্যও ভাড়া দিতে হত বৈকি! চাষীদের নিজস্ব যাঁতা বা উনুন রাখার অধিকার ছিল না। রাস্তা, সেতু প্রভৃতি

ব্যবহার করার জন্যও পয়সা দিতে হত জমিদারকে। বন এবং পশু-চারণ ক্ষেত্রের ব্যবহার প্রভৃতিও বিনা পয়সায় হত না। চাষীদের কাছ থেকে পুরোহিতরা আদায় করত টাইথ নামে এক কর। চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যেটুকু ফসল ফলাত তার খুব সামান্যই তাদের নিজের ভোগে লাগত।

ম্যানরের চাষীরা নানা শ্রেণীর ছিল। কেউ কেউ মোটামুটি স্বাধীনতা ভোগ করত। খাজনার বদলে তারা জমি চাষ করত। কেউ কেউ আর একটু কম স্বাধীন ছিল। বাকীরা ছিল চাকর-বাকরের মত। তারা সার্ফ, জমির সঙ্গে বাঁধা। জমিদারের অনুমতি না নিয়ে তারা জমি ছেড়ে যেতে পারত না। জমিদার তাদের বিক্রী করে দিতে পারত। জমিদার যদি তার কোন জমি অন্য কাউকে বিক্রী করে দিত, তবে, সেই জমির সার্ফগণও হয়ে যেত নতুন জমিদারের সম্পত্তি। জমিদারের চোখে সার্ফগণ ছিল গরু-ভেড়ার সামিল। জমিদার তাদের নিয়ে যা খুশী করতে পারত। জমিদার অনুমতি না দিলে সার্ফগণ নিজেরা বিয়ে পর্যন্ত করতে পারত না। তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ের সময়ও জমিদারের অনুমতির দরকার হত। অবশ্য বাস্তবে সার্ফদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করা হত না। কারণ তাহলে সার্ফরা পালিয়ে যেত বা বিদ্রোহ করত। সার্ফদের ছেলে-মেয়েরাও ছিল জমিদারের সম্পত্তি। সার্ফগণ বংশানুক্রমিক ভাবে জমিদারের সেবা করত।

চাষী বা সার্ফরা অত্যন্ত গরীব ছিল। নিজস্ব সম্পত্তি বলতে তাদের ছিল লাঙল, বলদ, ভেড়া ও শূকর। তারা বাস করত খড়ে ছাওয়া কাঁচা কুঁড়ে ঘরে। ওতে জানালা থাকত না। ঘর গরম রাখার জন্য আগুন জ্বেলে রাখা হত। কিন্তু ধোঁয়া বের হবার ভাল ব্যবস্থা না থাকায় নিঃশ্বাস নেওয়া ছিল খুবই কষ্টকর। ঘরে আসবাবপত্র বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। রাত্রে আলো জ্বালার খরচ অনেক। তাই সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই চাষীরা শুয়ে পড়ত। কালো রঙের আধ-পোড়া রুটি, নুন, মাখন, মাংস, শাক-সব্জী, দুধ, মদ প্রভৃতি ছিল

তাদের প্রধান খাদ্য ও পানীয়। তাদের বাচ্চাকাচ্চারা প্রায়ই বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। মেয়েরা চাষবাসের কাজ, বাচ্চাদের দেখা-শোনা, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা, জমিদারদের কাজকর্ম করে



মধ্যযুগের চাষী

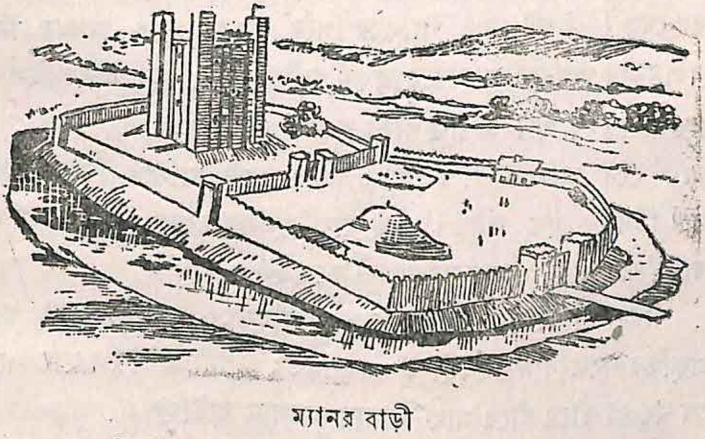
দেওয়া প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকত। সার্ফরা লেখাপড়ার কোন সুযোগ পেত না বলে তাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি তেমন ছিল না। তাদের নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করাই তখনকার ধনী লোকদের রীতি ছিল।

নানা অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও সার্ফদের জীবন একেবারে নিরানন্দ ছিল না। রোববার ও অন্যান্য ছুটির দিনে তারা নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করত। যাদু খেলা, নানা রকম দৈহিক কসরৎ, কুস্তি, ভালুক নাচ, নানা উৎসব, নাচ-গান, জমিদারের বাড়ীতে পান-ভোজন প্রভৃতি সার্ফদের জীবনে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিত। তাদের অভাববোধ কম থাকায়, মনে বেশ আনন্দ ছিল। তারা ছিল অল্পেই খুশী।

ম্যানরের বাসিন্দাদের প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায়; (২) জমিদার ও তাঁর পরিবার এবং (৩) চাষী ও সার্ফগণ। প্রতিটি ম্যানরে একটি করে গীর্জা থাকত। গীর্জার পুরোহিতগণ গীর্জার কাছেই বাস করত। তাদেরও নিজস্ব জমি ছিল। সার্ফদের দিয়েই এই জমি চাষ করা হত। পুরোহিতগণ সার্ফদের অবস্থা উন্নত করার জন্য তেমন কোন চেষ্টা করেননি। পুরোহিতরা যে সার্ফদের কাছ থেকে টাইথ নামে কর আদায় করতেন সে কথা আগে বলেছি। পুরোহিতদের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক ভাল ছিল। পুরোহিতরা ছিলেন জমিদারের অনুগত। কোন পুরোহিত মারা গেলে জমিদারই নূতন পুরোহিত নিযুক্ত করত।

জমিদার ম্যানরে অবস্থিত সব থেকে বড় বাড়ীতে বা পাথরের তৈরী দুর্গে বাস করত। একে বলা হত ম্যানর বাড়ী। সাধারণতঃ দুর্গগুলি তেতলা হত। এগুলিতে ভাঁড়ার, রান্নাঘর, শোবার ঘর, হলঘর, উপাসনা ঘর, চাকর-বাকরের ঘর, পায়খানা ও স্নানঘর প্রভৃতি থাকত। ঘরের দেয়ালগুলি ছিল খুবই পুরু। জানালা-দরজা ছোট ছোট হওয়ায় ঘরে ভাল ভাবে আলো-হাওয়া ঢুকত না। ফলে ঘরগুলি ছিল অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে। রাত্রে মোমবাতি ও মশাল জ্বালান হত। টেবিল, চেয়ার, খাট, সিন্দুক প্রভৃতি ছিল প্রধান আসবাবপত্র। সাদা রুটি, মাখন, মাংস, মাছ, দুধ, পনীর, শাক-সব্জী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খাবার টেবিলে জড় করা হত। বাড়ীতে চাকর-বাকরের অভাব ছিল না। রান্নাবাড়া, খাবার পরিবেশন, ঘরদোর পরিষ্কার ও নানা টুকটাক কাজ করতে হত তাদের। জমিদার দল বেঁধে শিকার ও যুদ্ধ করত। শিকারের সময় কুকুর ও বাজপাখী ছিল তার নিত্য সঙ্গী। শান্তির সময় **'টুর্ণামেণ্ট'** বা নকল যুদ্ধ করে তারা প্রচুর আনন্দ পেত।

ম্যানর বাড়ীতে প্রায়ই উৎসব, পান-ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হত। ম্যানরের সব বাসিন্দাদের তাতে ছিল ঢালাও নিমন্ত্রণ।



ম্যানর বাড়ী

নাচ, গান, হাসি-হল্লায় বড় বড় ঘরগুলি গমগম করত তখন। ভাঁড়েরা মজার মজার কথা বলে জমিদার ও তাঁর পরিবারের লোকজনদের

আনন্দ দিত; গায়ক ও বাদকেরা গান-বাজনা শোনাত। ফলে জমিদার-দের জীবন বেশ আনন্দেই কাটাত। সার্ফদের তুলনায় তারা স্বর্গসুখ ভোগ করত বলা যায়। তবু আজকের তুলনায় জমিদারদের বাড়ীগুলি খুব একটা আরামের ছিল না।

সমাজে জমিদার শ্রেণী ও সার্ফ সম্প্রদায়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। প্রথম শ্রেণী শাসক ও সুবিধা ভোগী। দ্বিতীয় শ্রেণী শাসিত, শোষিত ও সকল প্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রথম দল প্রভু, দ্বিতীয় দল সেবক। কাজেই তাদের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। জমিদারদের বিরুদ্ধে সার্ফদের অসংখ্য অভিযোগ ছিল। সুযোগ পেলেই তারা ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে যেত, দল বেঁধে বিদ্রোহ করত বা সবাই একসঙ্গে অন্যত্র সরে পড়ত। জমিদাররা তাদের ধরে এনে মারধোর করত ও নানা প্রকার শাস্তি দিত।

সার্ফগণ নানাভাবে তাদের দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করত। জমিদার টাকার বদলে তাঁদের মুক্তি দিতে দ্বিধা করত না। বনজঙ্গল বা জলাভূমি পরিষ্কার করার জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হত। এ কাজের জন্য জমিদাররা সার্ফদের মুক্তি দিয়ে সেসব জায়গায় বসবাসের জন্য পাঠাত। বহু সার্ফ জমিদারের অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেত। কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে শহরগুলিতে আশ্রয় নিত। সেখানকার কল-কারখানায় কাজকর্ম জুটিয়ে নেওয়া খুব কঠিন ছিল না। শহরগুলি বেশ ধনী ও শক্তিশালী হওয়ায় জমিদাররা সার্ফদের সেখান থেকে ধরে আনতে পারত না। কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে যুদ্ধ করত। বহু সার্ফ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্ম-যুদ্ধে যোগ দিয়ে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, নগর প্রতিষ্ঠা, কল-কারখানা স্থাপন প্রভৃতির ফলে সামন্তব্যবস্থা ও কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলেই ধীরে ধীরে সার্ফ-প্রথার অবসান ঘটেছিল।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ—নবম থেকে চতুর্দশ শতক সামন্ত-ব্যবস্থা

সারসংক্ষেপ ঃ সামন্ত ব্যবস্থার ভিত্তি হল জমি। রাজা কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে জমি ভাগ করে দিতেন। যারা জমি নিত তাদের নাম ভ্যাসাল। এই ভ্যাসালরা আবার তাদের জমি ভাগ করে দিত অন্যদের মধ্যে। এই ভাবেই জমি ভাগ করা হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সার্ফগণ জমি চাষের দায়িত্ব নিল। ভ্যাসালগণ তাদের প্রভুর অনুগত থাকতে বাধ্য ছিল। তারা প্রভুর প্রয়োজনে যুদ্ধ করত ও নানা কর দিত। রাজা বা সম্রাটের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ায় প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। তাই ভ্যাসাল বা জমিদারগণ রাজার হয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে শাসন চালাতে থাকে। পাথুরে দুর্গ ও বর্মাবৃত ঘোড়সওয়ার ছিল তাদের শক্তির উৎস। এদেরই সাহায্যে সামন্ত বা জমিদারগণ নানা বৈদেশিক আক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষা করেছিল। জমিদারগণ শুধু বীরই ছিল না। তারা নানা গুণেও ভূষিত ছিল।

জমিদারের অধীন গ্রামগুলিকে বলা হত ম্যানর। ম্যানরের জমি চাষ করত ম্যানরে বসবাসকারী সার্ফগণ। তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছু ম্যানরেই তৈরী করে নিত। জমিদার সার্ফদের কাছ থেকে নানা কর ও সেবা আদায় করত। জমি ছেড়ে তাদের চলে যেতে দেওয়া হত না। জমিদারের চোখে তারা গরু-ভেড়ার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। সার্ফদের বংশানুক্রমিক ভাবে দাসত্ব করতে হত। সার্ফরা অতি কষ্টে দিন চালাত। অন্য দিকে জমিদাররা আরামে-আয়াসে ডুবে থাকত। জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বহু সার্ফ ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে যেত। ধীরে ধীরে সার্ফ প্রথার অবলুপ্তি ঘটে।

অনুশীলনী

১। "সামন্তপ্রথা"র উদ্ভবের কারণ কি?

২। "সামন্তপ্রথা" বলতে কি বোঝ?

৩। সামন্ত ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি সম্পর্কে লেখ।

৪। সামন্তগণ রাজার কি কি ক্ষমতা প্রয়োগ করত?

৫। কিভাবে সামন্তগণ ইউরোপকে রক্ষা করেছিল?

৬। সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা সম্পর্কে কি জান ?

৭। শিভাল্‌রী সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

৮। ট্রুব্যাডুরদের সম্পর্কে কি জান ?

৯। ম্যানার কি ? ম্যানারের মালিক কে ছিল ? এটি কিসের কেন্দ্র রূপে গণ্য হত ?

১০। সার্ফদের কাছ থেকে জমিদার কি কি কর ও সেবা আদায় করত ?

১১। জমিদারদের জীবন ধারা সম্পর্কে কি জান ?

১২। সার্ফদের জীবন সম্পর্কে লেখ।

১৩। সার্ফগণ কি ভাবে মুক্তিলাভ করত ?

১৪। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) সমগ্র রাজ্যের জমির মালিক কে ছিলেন ?

(খ) শিভাল্‌রী কথাটির অর্থ কি ?

(গ) ট্রুব্যাডুগণ প্রথম কোথায় আবির্ভূত হয় ?

(ঘ) ম্যানর আদালতে সাধারণতঃ কি শাস্তি দেওয়া হত ?

(ঙ) ম্যানরের বাসিন্দারা কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ?

১৫। শুদ্ধ উত্তরটি খাতায় লেখ :—

(ক) সামন্তব্যবস্থা গড়ে ওঠে—ব্যবসা/জমি/অস্ত্রকে কেন্দ্র করে।

(খ) কোন্ ধর্মের প্রভাবে নাইট হবার অনুষ্ঠানটি জাঁকাল হয় ?—বৌদ্ধধর্ম গ্রীষ্টধর্ম/ইসলাম ধর্ম।

(গ) টাইথ কি ?—মাথাপিছু কর/একরকম শাস্তি/ধর্মীয় কর।

(ঘ) সার্ফগণ কিসের সঙ্গে বাঁধা থাকত ?—জমি/কুঁড়ে/খুঁটি।

(ঙ) জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রায়ই বিদ্রোহ করত—স্বাধীন প্রজা/ভ্যাসাল/সার্ফ

১৬। কেবল শুদ্ধ উত্তরটি খাতায় লেখ :—

(ক) নাইটরা কেবল অত্যাচার করত, তাদের কোন গুণ ছিল না।

(খ) ম্যানরে সব চাষীরা মিলে চাষবাস করত।

(গ) জমিদাররা কালো, আধপোড়া রুটি খেত।

(ঘ) মুক্তিলাভের জন্য সার্ফগণ শহরে পালিয়ে যেত।

(ঙ) সার্ফগণ জমিদারের জমিতে সপ্তাহে পাঁচদিন বেগার খাটত।

(চ) নাইটগণ ইসলাম ধর্ম মেনে চলত।

(ছ) ম্যানরগুলির ছিল প্রায় সকল ক্ষেত্রে স্বনির্ভর।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

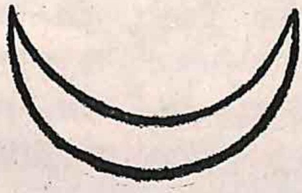
ক্রুসেড-এর উদ্দেশ্য ● সমাজ ও সংস্কৃতিতে ক্রুসেডের প্রভাব ● নূতন নূতন শহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র ● কৃষির সঙ্গে সম্পর্কহীন নানা কুটীরশিল্প।

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই কিভাবে আরবের মুসলমানগণ ইউরোপের পূর্ব ও দক্ষিণ দিক আক্রমণ করেছিল, সেকথা আগে বলেছি। ইউরোপের খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আরবগণ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন (ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে অবস্থিত) দখল করে নেন। এইসব অঞ্চলে বিশেষ করে প্যালেস্টাইনের জেরুজালেমে খ্রীষ্টানদের বেশ কয়েকটি পবিত্র তীর্থস্থান রয়েছে। এই স্থানগুলিতে খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্ট, তাঁর মা মেরী ও অন্যান্য সাধুসন্তদের বহু পুণ্যস্মৃতি ছড়িয়ে আছে। খ্রীষ্টানগণ পাপক্ষালনের জন্য জীবনে অন্ততঃ একবার এইসব তীর্থস্থান দেখে যাবার চেষ্টা করত। আরবগণ জেরুজালেমে আসা খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের ওপর তেমন অত্যাচার করত না। একাদশ শতাব্দীতে তুর্কী মুসলমানগণ জেরুজালেম দখল করে নেয়। তারা তীর্থযাত্রীদের নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টানগণ তীর্থযাত্রীদের মুখে, তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অনেকে বলেন, তুর্কীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে খ্রীষ্টানগণ জেরুজালেম ও অন্যান্য পবিত্র তীর্থস্থানগুলি মুসলমানদের কবল থেকে কেড়ে নেবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেছিল। এরই নাম "ক্রুসেড" বা ধর্মযুদ্ধ। তুর্কীদের অত্যাচার নিঃসন্দেহে "ক্রুসেডের" একটি কারণ। কিন্তু সেটি কখনো প্রধান কারণ ছিল না। অত্যাচার সত্ত্বেও তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা কিন্তু দিনদিন বেড়েই যাচ্ছিল। ক্রুসেডের প্রকৃত কারণ ছিল পোপের ক্ষমতা-লিপ্সা, সামন্তদের রাজ্যজয় ও লুঠপাটের আকাঙ্ক্ষা ও বণিকদের পূর্বদেশে বাণিজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা।

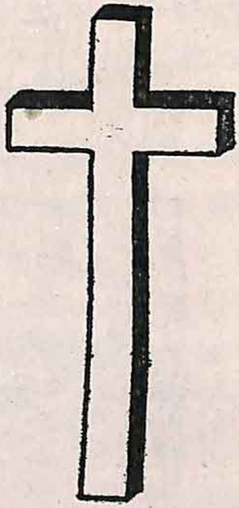
পোপ তখন পবিত্র রোমান সম্রাট চতুর্থ হেনরীর সঙ্গে ইনভোস্টচার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ভাবলেন, যদি খ্রীষ্টান সামন্ত, রাজা ও জনগণকে তাঁর নেতৃত্বে ধর্মযুদ্ধে পাঠান যায় তবে পশ্চিম ইউরোপের সকলে তাঁকেই নেতা বলে মেনে নেবে। এর ফলে পোপের ক্ষমতা বাড়বে ও সম্রাটের মর্যাদা কমে যাবে। ক্লুনী মঠের সংস্কার প্রভৃতির ফলে জনসাধারণের ধর্মভাব বেশ জোরাল হয়েছিল। এটিকে কাজে লাগিয়ে তাদের ধর্মযুদ্ধে পাঠান মোটেই কঠিন নয়। এসময় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট প্রথম আলেক্সিয়াস পোপ দ্বিতীয় আরবান-এর কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য ভিক্ষা করেন। পোপ দেখলেন এই সুযোগ। এই সময় তাঁকে সাহায্য দিলে পূর্ব সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান গীর্জা রোমের পোপের বশীভূত হতে পারে। তাই পোপ দ্বিতীয় আরবান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খ্রীষ্টানদের আহ্বান করলেন। তিনি নিজে ছিলেন ফরাসী। তাই তাঁর আহ্বানে সব থেকে বেশী সাড়া দিল ফরাসীগণ। পোপ সামন্তদের বললেন, 'কোন লোভে পড়ে আছ তোমাদের এই অনুর্বর দেশে। চলে যাও জেরুজালেমে—যেখানে স্রোত বয়ে যাচ্ছে দুধ আর মধুর।' ধর্মযুদ্ধে যোগ দিলে সব পাপ-তাপ ধুয়ে মুছে যাবে একথাও তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন। সাধু পিটার এবং ওয়াল্টার নামে এক কানাকড়িহীন নাইটও ক্রুসেডে যোগ দেবার জন্য জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকেন। তাঁদের প্রচারের ফলে হাজার হাজার চাষী ও সামন্ত বাড়ীঘর, পরিবার-পরিজন ফেলে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হয়। সামন্ত ও নাইটগণ প্রধানতঃ দুঃসাহসিক কাজের লোভে, রাজ্যজয় ও লুঠপাটের আশায় ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

তুর্কীরা ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরস্থ দেশগুলি দখল করে নেওয়ায় এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যপথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তাই ইউরোপের বণিকগণ ক্রুসেডের সাহায্যে ঐ পথগুলি আবার খোলার চেষ্টা করে। ইটালীর কয়েকটি নগরের বণিকগণ এই উদ্দেশ্য ধর্ম-যোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করেছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, পশ্চিম

ইউরোপের খ্রীষ্টানগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পোপের নেতৃত্বে মুসলমানদের কবল থেকে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের পবিত্র তীর্থস্থানগুলি উদ্ধারের জন্য দীর্ঘ লড়াই চালিয়েছিল। একেই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বলা হয়। খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধাদের



বাঁকা চাঁদ



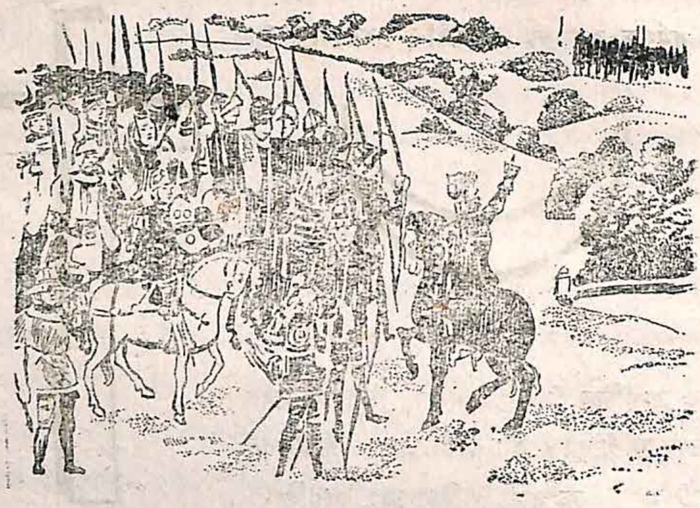
ক্রুশ

বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকা থাকত। মুসলমানদের পতাকায় আঁকা থাকত বাঁকা চাঁদ। খ্রীষ্টানগণ মোট নয়টি ক্রুসেড পরিচালনা করেছিল। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেড বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম ক্রুসেডের সময় (১০৯৬-১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথমে প্রায় দশ হাজার লোক সাধু পিটারের নেতৃত্বে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হয়। এরা ভাল যোদ্ধা ছিল না। ফলে তুর্কীরা সহজেই এদের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলে। এরপর পঁচিশ-ত্রিশ হাজার খ্রীষ্টান সৈন্য পূর্ব সম্রাটের সাহায্য নিয়ে অ্যান্টিয়োক ও জেরুজালেম দখল করে। ক্রুসেডগুলির মধ্যে প্রথম ক্রুসেডটিই সব থেকে সফল হয়েছিল। জেরুজালেমে শীঘ্রই একটি খ্রীষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর একাংশ মুসলমানেরা দখল করলে দ্বিতীয় ক্রুসেড শুরু হয়। এতে খ্রীষ্টানরা পরাজিত হয়েছিল।

১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান সম্রাট সালাদিন জেরুজালেম দখল করেন। তিনি ছিলেন সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সুলতান। এই দুঃসবাদ শুনে ইউরোপের খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়। এবার পবিত্র রোমান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস, ইংলণ্ডের বীর রাজা প্রথম রিচার্ড প্রভৃতি তৃতীয়

ক্রুসেড (১১৮৭-১১৯২ খ্রীঃ) শুরু করলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ফ্রেডারিক পথে জলে ডুবে মারা যান এবং ফিলিপ অগাস্টাসও কিছুদিন পরে দেশে ফিরে আসেন। রিচার্ড একাই সালাদিনের



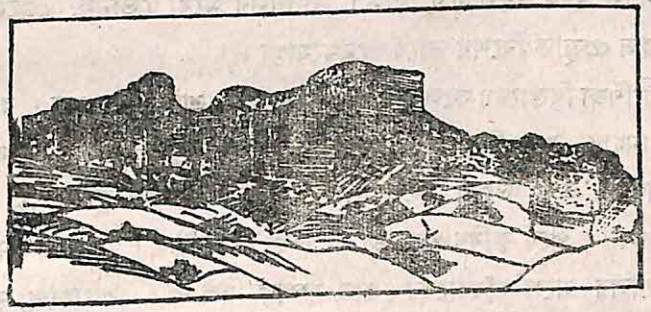
ক্রুসেডের জন্য প্রস্তুত খ্রীষ্টান সৈন্যবাহিনী

বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁর চাপে সালাদিন শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সন্ধি করেন। এর ফলে খ্রীষ্টানগণ লাভ করে প্যালেস্টাইন-এর কিছু অংশ এবং জেরুজালেমের তীর্থ করতে যাবার অধিকার। জেরুজালেম অবশ্য সালাদিনের হাতেই থাকল।

পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট চতুর্থ ক্রুসেডের (১২০২-১২০৪ খ্রীঃ) ডাক দেন। এটিরও উদ্দেশ্য ছিল জেরুজালেমের পুনরুদ্ধার। ইটালীর ভেনিস নগরী ছিল বাণিজ্য সমৃদ্ধ। এখানকার বণিকগণ এই ক্রুসেডের সময় ধর্মযোদ্ধাদের নিজেদের জাহাজে করে কন্‌স্ট্যান্টিনোপলে পৌঁছে দেয়। ভেনিসের বণিকগণ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্ট্যান্টিনোপলকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবত। এটিকে ধ্বংস করতে পারলে তাদের প্রচুর লাভের সম্ভাবনা ছিল। তাই তারা ধর্ম-যোদ্ধাদের কন্‌স্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করার জন্য উস্কানি দিতে থাকে। ফলে ধর্মযোদ্ধারা ভেনিসের সাহায্যে কন্‌স্ট্যান্টিনোপল দখল করে বসে। সুতরাং চতুর্থ ক্রুসেড পরিচালিত হয়েছিল পূর্ব রোমান

সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে, জেরুজালেমের মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়।

ক্রুসেডগুলির ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহু সামন্ত ক্রুসেডগুলিতে যোগ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। ক্রুসেডে যাওয়ার আগে অনেকে তাদের জমিজমা বিক্রী করে দেয়। কেউ কেউ টাকার বদলে সার্ফদেরও মুক্তি দিয়েছিল। এইভাবে সামন্তগণ দুর্বল হয়ে পড়ায় সামন্তব্যবস্থার পতন



ধর্মযোদ্ধাদের নির্মিত দুর্গ

শুরু হয়। ফলে সমাজেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। বহু সার্ফ ও ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। ফলে সার্ফ প্রথারও অবসান সূচিত হয়। ক্রুসেডের ফলে নগরগুলি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সার্ফগণ এখানে কাজ পেয়ে স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা লাভ করে।

সামন্তরা ক্রুসেডে গেলে তাদের স্ত্রীরা জমিদারী দেখা শোনার কাজ করতে থাকে। এর ফলে সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ক্রুসেডের সময় পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টানগণ উন্নত সভ্যতার অধিকারী মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সুসভ্য খ্রীষ্টানগণ তাদের কম প্রভাবিত করেনি। এদের কাছ থেকে তারা বহু নূতন খাদ্য, ফলমূল, পোশাক, মশলা, বিলাসদ্রব্য, রঙ, আসবাবপত্র, শিল্প ও স্থাপত্যরীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। বহু বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে খ্রীষ্টানরা তাদের ভাষাগুলি সমৃদ্ধ করে তোলে। ধর্মযোদ্ধাদের কাহিনী সাহিত্য ও ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ক্রুসেডের সময় গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কিছু গ্রন্থও

গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়। নানা দেশভ্রমণ করার ফলে গ্রীষ্টানগণ কুসংস্কারমুক্ত, উদরে ও পরমধর্মমত-সহিষ্ণু হয়।

ধর্মযোদ্ধাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য রাস্তার ধারে ধারে দোকান ও বাজার বসত। এগুলিকে কেন্দ্র করে পরে নগর গড়ে ওঠে। ক্রুসেডের ফলে পূর্বদেশগুলির সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্য-সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। এই বাণিজ্য করে ইউরোপের বহু নগর বিশেষ করে ইটালীর বন্দরগুলি খুবই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্য বিস্তারের ফলে ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। বণিক, দোকানদার, শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তি প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। ক্রুসেডের প্রয়োজনে এবং উহার ফলে পশ্চিম ইউরোপে বহু কুটীরশিল্প গড়ে উঠেছিল। পূর্বে কৃষির প্রয়োজনেই শিল্প গড়ে উঠত। কিন্তু এখানকার শিল্পগুলির সঙ্গে চাষবাসের কোন সম্পর্ক ছিল না। সংক্ষেপে, কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তন সূচিত হয় এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির পথ প্রস্তুত হতে থাকে।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ	১০৯৬—১০৯৯	প্রথম ক্রুসেড
	১১৪৭—১১৪৮	দ্বিতীয় ক্রুসেড
	১১৮৭—১১৯২	তৃতীয় ক্রুসেড
	১২০২—১২০৪	চতুর্থ ক্রুসেড

সারসংক্ষেপ ● মুসলমানদের হাত থেকে সিরিয়া ও জেরুজালেমে অবস্থিত খ্রীষ্টানদের তীর্থস্থানগুলি পুনরুদ্ধার করাই ছিল ক্রুসেডগুলির উদ্দেশ্য। এ ছাড়া পোপের ক্ষমতালিপ্সা, সামন্তগণের রাজ্যজয়ের ইচ্ছা ও বণিকদের বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও ক্রুসেডগুলির মূলে ছিল। খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের ওপর তুর্কী মুসলমানদের অত্যাচার ছিল ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ কারণ। এই সব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টানগণ মোট নয়বার মুসলমানদের

বিরুদ্ধে ক্রুসেড চালায়। ক্রুসেড কথাটির অর্থ ধর্মের জন্য যুদ্ধ। প্রথম ক্রুসেডের ফলে জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের হাতে আসে। কিন্তু শীঘ্রই মুসলমানগণ সেটি দখল করে নেয়। তৃতীয় ক্রুসেডের ফলে খ্রীষ্টানগণ সেখানে নিরাপদে তীর্থ করতে যাওয়ার অধিকার লাভ করে। চতুর্থ ক্রুসেড পরিচালিত হয়েছিল খ্রীষ্টানরাজ্য পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়।

ক্রুসেডগুলির ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। এর ফলে সামন্তগণ দুর্বল হয়ে পড়ে, বহু সার্ফ মুক্তি পায় এবং সমাজে নারীজাতির মর্যাদা বেড়ে যায়। খ্রীষ্টানগণ উন্নত সভ্যতার অধিকারী মুসলমানদের কাছ থেকে অনেক নূতন জিনিস ও বিদ্যা শেখে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বহু নূতন নগর ও শিল্প গড়ে ওঠে। এরই ফলে ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে।

অনুশীলনী

১। ক্রুসেড বলতে কি বোঝ ? মোট কয়টি ক্রুসেড পরিচালিত হয়েছিল ? কোন্ কোন্ ক্রুসেড গুরুত্বপূর্ণ ?

২। ক্রুসেডের কয়েকটি উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ক্রুসেডে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?

৩। প্রথম ক্রুসেডের ফল কি হয়েছিল ?

৪। তৃতীয় ক্রুসেড সম্পর্কে কি জান ?

৫। চতুর্থ ক্রুসেড কোন্ দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় ?

৬। ক্রুসেডের ফলাফল বর্ণনা কর।

৭। ক্রুসেডগুলি কিভাবে নগর ও শিল্পগঠনে সাহায্য করেছিল ?

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) —খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেড শুরু হয়।

(খ) সাধু—প্রথম ক্রুসেডে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেন।

(গ) পোপ দ্বিতীয়—ক্রুসেডের ডাক দেন।

(ঘ) ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে—জেরুজালেম দখল করে নেন।

(ঙ) ক্রুসেডের ফলে ইটালীর—গুলি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

(চ) ইটালীর ভেনিস নগরী ছিল বাণিজ্য—।

নবম অধ্যায়

নগর ও নগর জীবন

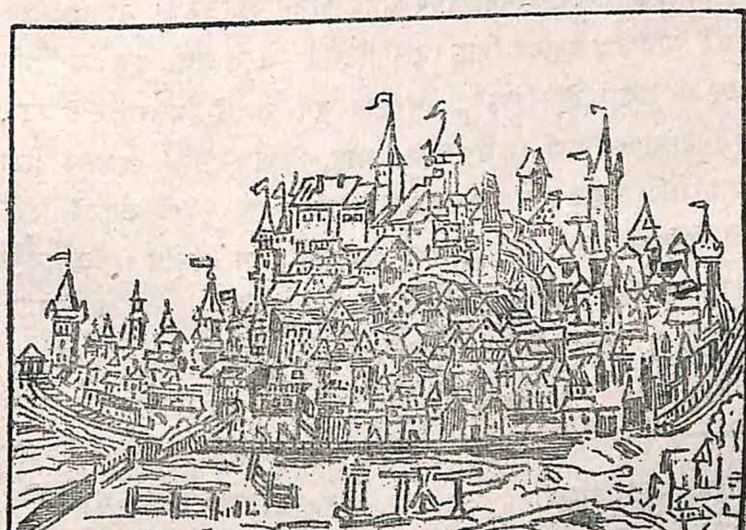
নগরের উত্থান ● ক্রুসেডের প্রভাব ● গিল্ড বা সঙ্ঘ ● নগরজীবন ● নগরগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ ● 'বুর্জোয়া' কথাটির উৎপত্তি।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই তিন যুগেই শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হল নগর। বর্বর জাতিগুলির আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ নগরই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নানা কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে নগরের পরিবর্তে গ্রাম-কেন্দ্রিক সভ্যতাই গড়ে ওঠে। এই গ্রাম বা ম্যানরের কথা তোমাদের আগে বলেছি। সামন্ত ব্যবস্থা দৃঢ় হবার পর পশ্চিম ইউরোপে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা কিছু পরিমাণে ফিরে আসে। বিদেশীদের হটিয়ে দেবার পর ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। ক্রুসেডের সময় পূর্বাঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হওয়ায় ব্যবসার প্রসার হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম ইউরোপে অবার ছোট-বড় নগর গড়ে ওঠে। শুরু হয় নগর সভ্যতার। খ্রীষ্টীয় দশম শতক থেকেই নগর নির্মান শুরু হয়। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বেশ বড় ধরনের নগর তৈরী হতে থাকে।

নগরের উৎপত্তিঃ নানা কারণে নগরের উৎপত্তি হয়েছিল। রোমান আমলে ভেঙ্গে পড়া নগরগুলি মেরামত করে নূতন নগর গড়ে তোলা হয়। কাউন্ট, ডিউক প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীদের প্রাচীর-ঘেরা পাকা বাড়ীকে কেন্দ্র করে অনেক সময় শহর গড়ে ওঠে। বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পাথরের দুর্গ তৈরী করা হত। বিপদের সময় গ্রামবাসীরা এতে আশ্রয় নিত। এই দুর্গগুলি হয়ে ওঠে বহু নগরের ভিত্তি। সামন্তদের ম্যানর বাড়ী ও দুর্গের কথা তোমরা আগে জেনেছ। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা থাকলে এগুলি নগর হিসাবে গড়ে উঠত। কোন কোন ম্যানরে

বিশেষ শিল্প গড়ে ওঠায় নগরের সৃষ্টি হত সেখানে। বাজারে বা মেলার জায়গায়, রাজপথ বা নদীর ধারে ধারে, খেয়াঘাটের কাছে, সমুদ্রের উপকূলে, রাজার বাসস্থানে, গীর্জা বা মঠের কাছে নগর গড়ে ওঠে। ধর্মযোদ্ধাদের যাত্রাপথের ধারে ধারে অসংখ্য নগর গড়ে উঠেছিল। ধর্মযোদ্ধাদের আশ্রয় দান, প্রয়োজনীয় জিনিস যোগান দেওয়া প্রভৃতি কারণেই সরাইখানা ও দোকান-বাজার বসে। কালক্রমে সেখানে গড়ে ওঠে শহর বা নগর। ফিরিওয়ালা বা বণিকদের বাসস্থানও নগরে পরিণত হত।

গিল্ড ঃ মধ্যযুগের নগরগুলি খুব বড় হত না। এগুলি ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বহু লোক বাস করত বলে নগরগুলি ছিল ঘিঞ্জি ধরনের। নগরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। কারিগররা এখানে জিনিস তৈরী করে বিক্রী করত। বাইরে থেকে আনা জিনিসও



নগর

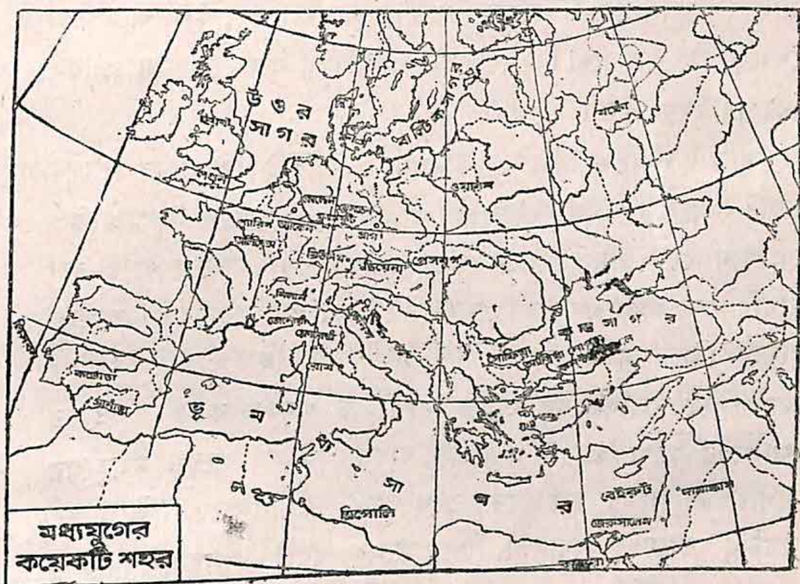
কেনা-বেচা চলত এখনে। নগরগুলির কর্তা ছিল সামন্ত, বিশপ প্রভৃতি। তারা নগরবাসীদের কাছ থেকে নানা শুল্ক ও কর আদায় করত। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালপত্র নিয়ে যাবার সময়

বণিকরা শুল্ক দিতে বাধ্য ছিল। পথে দস্যু-তস্করের অত্যাচার তো ছিলই। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নগরগুলিকে সদা-সতর্ক থাকতে হত। এই সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য শহরের বণিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এদের সঙ্ঘকে বলা হত "মার্চেণ্ট গিল্ড" বা বণিকসঙ্ঘ। এই গিল্ড শহরের বণিকদের অত্যাচার, অবিচার লুঠপাট প্রভৃতি থেকে রক্ষা করত। সঙ্ঘের নিজস্ব কোষাগার ও সৈন্য বাহিনীও থাকত। নগরের সমস্ত কেনা-বেচার তদারকি করত মার্চেণ্ট গিল্ড। কোন বণিক ওজনে বা মাপে কম দিলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। জিনিসপত্র চড়া দামে বেচা নিষিদ্ধ ছিল। সঙ্ঘের কোন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়লে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সঙ্ঘ তাকে উপযুক্ত সাহায্য দিত। সঙ্ঘের সদস্যদের সভা বসত গিল্ড হল বা সঙ্ঘের বাড়ীতে।

মার্চেণ্ট গিল্ডের সদস্যগণই নগর শাসন করতেন। নগরগুলিতে শীঘ্রই আর এক ধরনের গিল্ড গড়ে উঠল। একে বলা হত কারিগর সঙ্ঘ বা "ক্র্যাফ্‌ট" গিল্ড"। শহরের সব কসাই মিলে কসাই সঙ্ঘ, রুটিওয়ালারা মিলে রুটিওয়ালা সঙ্ঘ, মোম-বাতি প্রস্তুতকারীরা মোমবাতি প্রস্তুতকারী সঙ্ঘ প্রভৃতি গড়ে তুলত। এই ভাবেই তৈরী হল স্বর্ণকার সঙ্ঘ, কর্মকার সঙ্ঘ, চর্মকার সঙ্ঘ প্রভৃতি। ক্র্যাফ্‌ট গিল্ড-এর তিন ধরনের সদস্য ছিলঃ (১) মাস্টার, (২) জার্নিম্যান এবং (৩) অ্যাপ্রেন্টিস। মাস্টারের নিজস্ব কারখানা ও দোকান থাকত। সে ছিল সুদক্ষ কারিগর। সে কর্মচারীদের সাহায্যে কাঁচামাল থেকে নানা জিনিস তৈরী করে দোকানে বেচত। জার্নিম্যান কাজের বদলে মজুরী পেত। বহু বছর অ্যাপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ কারার পর জার্নিম্যান হওয়া যেত। জার্নিম্যান নিজে কারখানা ও দোকান খুললে মাস্টার বলে পরিচিত হত। অনেক সময় মাস্টার হবার আগে তাকে একটা পরীক্ষা দিতে হত। তাঁর সেরা হাতের কাজটি দেখিয়ে পরীক্ষককে সন্তুষ্ট করতে পারলে মাস্টার হতে আর বাধা ছিল না। কারিগরের এই সেরা

কাজটির নাম 'মাস্টার পীস'। সবার নীচে ছিল অ্যাপ্রেন্টিস বা শিক্ষা নবীশ। খুব ছোট বয়সে কোন মাস্টারের অধীনে তাকে কাজ শেখা শুরু করতে হত। সাত বা দশ বছর ধরে শিক্ষানবিশী করার পর সে জার্নিম্যান হতে পারত। তার খাওয়া-পরার ভার ছিল মাস্টারের ওপর।

ক্রাফ্‌টগিল্ডের প্রধান কাজ ছিল তার সদস্য কারিগরদের স্বার্থ রক্ষা করা। গিল্ড কারিগরদের কাজ করার সময় ও মজুরীর পরিমাণ বেঁধে দিত। তারা যে সকল জিনিস তৈরী করবে তার মান ঠিক করে দেওয়াও ছিল গিল্ডের কাজ। যারা লোককে ঠকাত বা বেশী লাভ করতে চাইত তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। রুটিওয়ালা কম



মধ্যযুগের কয়েকটি শহর

ওজনের রুটি দিলে তাকে একটা খাঁচায় পুরে রাস্তা দিয়ে-টেনে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হত তারই হাতে গড়া রুটির মালা। কেউ খারাপ মদ বেচলে তাকে তার কিছুটা জোর করে খাইয়ে দেওয়া হত। বাকীটা ঢেলে দেওয়া হত তার গায়ে। ক্র্যাফ্‌ট গিল্ডগুলি অসুস্থ ও বৃদ্ধ সদস্যদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করত, মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা করত এবং বিধবার

ভরণ-পোষণের ভার নিত। ক্র্যাফ্‌ট গিল্ডের উদ্যোগে বেশ কিছু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলি নাটকের অভিনয়েও উৎসাহ দিত। মার্চেণ্ট গিল্ড ও ক্র্যাফ্‌ট গিল্ড উভয়েই একচেটিয়া ভাবে ব্যবসা বা জিনিসপত্র তৈরী করতে চাইত। গিল্ডের সদস্য না হলে কেউ শহরে এসে ওসব করতে পারত না।

নগর জীবন ঃ আগেই বলা হয়েছে, মধ্যযুগের নগরগুলি ছিল ছোট ও ঘিঞ্জি। এগুলি মোটেই পরিষ্কার ছিল না। বাড়ীগুলি দেখতে ছিল খুবই সাধারণ। অবশ্য চার-পাঁচ তলা-উঁচু বাড়ী দেখতে পাওয়া যেত। অধিকাংশ বাড়ীই ছিল কাঠের তৈরী, চাল খড়ে ছাওয়া।

এগুলিতে প্রায়ই আগুন-ধরে যেত। শহরগুলিতে জল সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। নগরের রাস্তাগুলো ছিল সরু, কাঁচা বা এবড়ো খেবড়ো পাথর বসানো। শহরগুলি অপরিচ্ছন্ন বলে সেখানে প্রায়ই মহামারী দেখা দিত।

রাস্তার দু'পাশে ছিল দোকানপাট। প্রতিটি দোকানের সামনে একটি কাঠের ফলক ঝোলান থাকত। এই ফলকে আঁকা থাকত দোকানে যে জিনিস বিক্রি হচ্ছে তারই ছবি। নগরের কারিগররা নাগরিকদের প্রয়োজন মত জিনিসপত্রই তৈরী ও বিক্রী করত। শহরের বাজার ছিল গল্পগুজবের জায়গা। এর কাছেই ছিল গীর্জা। উৎসবের দিনগুলিতে লোকজনের ভীড়ে রাস্তাঘাট গমগম করত। শহরের লোকদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি বাধত। এ সব সত্ত্বেও মধ্যযুগের নাগরিকরা গ্রামের চেয়ে অনেক সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করত। সার্ফদের তুলনায় তাদের স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশী। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নগরগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং নাগরিকদের জীবনের মানও যথেষ্ট উন্নত হয়।

মার্চেণ্ট গিল্ডগুলির একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নগরের মালিক রাজা, সমস্ত বা বিশপদের কাছ থেকে নানা 'সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা আদায় করা। সাধারণতঃ নগদ অর্থের বিনিময়ে তারা নানা অধিকার আদায় করত। ক্রুসেডের সময় রাজা ও সামন্তদের নগদ

অর্থের দরকার হত। কারণ তাদের বহুদিনের জন্য দূর দেশে যেতে হবে। তাঁদের এই অভাব মেটাল নগরের বণিকরা। টাকার বদলে তারা দাবী করল নানা অধিকার ও স্বাধীনতা। বহু ক্ষেত্রেই তারা এগুলো পেয়েছিল। নাগরিকগণ নগরের মালিক রাজা বা সামন্তের কাছে থেকে আদায় করা অধিকারগুলি দলিলে লিখিয়ে নিত। এগুলিকে বলা হত "চার্টার"। সামন্তরা নগরগুলিকে ভাল চোখে দেখত না। এরা ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই সুযোগে রাজা নগরগুলিকে নানা অধিকার দান করে তাদের নিজের বশে রাখত। এই ভাবে বহু নগর স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করে।

মধ্যযুগের বিখ্যাত নগরগুলির মধ্যে কোলন, জেনোয়া, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো, অ্যান্টওয়ার্প প্রভৃতি নাম করা যেতে পারে। নগরের বাসিন্দাদের "বুর্জোয়া" বলা হত। বুর্জোয়া বলতে প্রধানতঃ বণিক, কারিগর প্রভৃতিকেই বোঝাত। এরা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অর্থাৎ তারা ছিল সামন্ত ও সার্ফদের মাঝামাঝি স্থানে। সামন্তের দুর্গ বা বিশপের বাসস্থানের কাছে তাদের প্রজারা বাস করত। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রজাদের বাসস্থান-গুলিও প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। বণিক, কারিগর প্রভৃতি কেনা-বেচার উদ্দেশ্যে এই প্রাচীরের বাইরে এসে বসবাস করতে থাকে। শীঘ্রই তাদের বাসস্থানও প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। এই বণিক প্রভৃতিকে বলা হত "বারজেস" বা বারগার। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীই বুর্জোয়া নামে পরিচিত হয়। বর্তমান যুগে এই বুর্জোয়াদেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ	—দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী	নগরগুলির উত্থান ও উন্নতি

সারসংক্ষেপ ● শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রাচীর ঘেরা দুর্গ, মঠ, গীর্জা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে ওঠে। এ ছাড়া নগর সৃষ্টির মূলে আরও অনেক কারণ ছিল। ক্রুসেডগুলির ফলে বহু নগরের উৎপত্তি ঘটে।

নগরের বণিক ও কারিগরগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সঙ্ঘ বা 'গিল্ড' গঠন করত। নগরের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করত এরাই।

মধ্যযুগের নগরগুলি ছোট ও ঘিঞ্জি ছিল। এগুলির বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট মোটেই সুন্দর ছিল না। নগরে প্রায়ই আগুন লাগত ও মহামারী দেখা দিত। তা সত্বেও নাগরিকরা মোটামুটি আরামেই বাস করত। তারা সার্ফদের তুলনায় অনেক স্বাধীন ছিল। নগরের বাসিন্দারা টাকার বিনিময়ে নগরের মালিক রাজা, সামন্ত বা বিশপদের কাছ থেকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করত। নগরের বাসিন্দা বণিক, কারিগর প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে পরিচিত ছিল। তাদের নাম ছিল বুর্জোয়া।

অনুশীলনী

১। নগরের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

২। নগরের উত্থনে ক্রুসেডের ভূমিকা কি?

৩। 'গিল্ড' বলতে কি বোঝ? নগরে কি কি গিল্ড ছিল? তাদের কাজ সম্বন্ধে কি জান?

৪। নগর-জীবন সম্পূর্ণ সংক্ষেপে লেখ।

৫। নগরগুলি কি ভাবে বিভিন্ন অধিকার আদায় করত?

৬। বুর্জোয়া কথাটির অর্থ কি? কিভাবে এর উৎপত্তি হয়েছিল?

৭। দু'এক কথায় উত্তর দাও:—

(ক) ক্র্যাফ্‌ট গিল্ডের সদস্য কর়া হত?

(খ) ক্র্যাফ্‌ট গিল্ডে কয় ধরনের সদস্য ছিল?

(গ) মার্চেণ্ট গিল্ডের প্রধান কাজ কি ছিল?

(ঘ) নগরের রাস্তাগুলো অন্ধকার হত কেন?

(ঙ) দোকানের কাঠের ফলকে কি লখা থাকত?

(চ) মধ্যযুগের দুটি বড় শহরের নাম কর।

(ছ) রাজা বা সামন্তগণ কর্তৃক নগরগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দানের দুটি কারণ লেখ।

(জ) নাগরিকরা গ্রামের লোকদের তুলনায় কিভাবে বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করত?

(ঝ) ধর্মযোদ্ধাদের পথের ধারে কেন নগর গড়ে উঠেছিল?

(ঞ) মাস্টারপীস কি?

মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : চীন

মধ্যযুগে চীন (খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতক) ● ত্য'াংযুগ (৬১৮-৯০০খ্রীঃ) —চীন পুনরায় ঐক্যবদ্ধ ● বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি ● জাপান কোরিয়া আনামে চৈনিক সভ্যতার বিস্তার ● হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তন ● সুংবংশ (৯৬০-১২৮০ খ্রীঃ)—রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য, কৃষকদের ঋণপ্রদান, সম্পত্তি কর; শিক্ষা ও সংস্কৃতি ● য়ুয়ান যুগ (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীঃ) ● মোঙ্গল জাতি ● কুব্‌লাই খান ● মার্কোপোলোর বিবরণ।

চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ দূর প্রাচ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চল ইউরোপ থেকে অনেক দূরে পূর্ব দিকে অবস্থিত বলেই এর নাম দূর প্রাচ্য। প্রাচ্য কথাটির অর্থ পূর্ব দেশ। ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমরা চীনের ইতিহাসের প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে অনেক কথা জেনেছ। চীনের চি'ন বংশের বিখ্যাত সম্রাট সি-হুয়াং-তি-র (খ্রীষ্টপূর্ব ২২১ ? থেকে ২১২ ? খ্রীষ্টাব্দ) কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। তাঁর বংশের পতনের পর সুবিখ্যাত হ্যান বংশের (খ্রীঃ পূঃ ২০৬ থেকে ২২১ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব শুরু হয়। এই বংশের পতনের পর প্রায় চারশ' বছর ধরে চীনে বৈদেশিক আক্রমণ, নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঘোর অরাজকতা চলে। চীনের ঐক্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং জনগণের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। এই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে যে রাজবংশ চীনে ঐক্য, শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনে তার নাম ত্য'াং বংশ (৬১৮—৯০৭খ্রীঃ)। অবশ্য ত্য'াং বংশের পূর্ববর্তী সুই বংশই এই উন্নতির সূচনা করেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিভক্ত চীন এই বংশের আমলেই ঐক্যবদ্ধ হয়।

ত্য'াং বংশ দীর্ঘকাল ধরে চীনের এই ঐক্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ত্য'াং বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লি য়ুয়ান। তিনি কাও-সু নামেও পরিচিত। কিন্তু এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার সম্মান পেয়ে থাকেন তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী তা ই সুং। পুত্রের সাহায্য না পেলে

লি য়ুয়ান স্থই বংশের শেষ সম্রাট ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিদের পরাজিত করে চীনের সিংহাসন দখল করতে পারতেন না। লি য়ুয়ান বা কাও-সুর রাজধানী ছিল চাং-আন-এ। ত্যাং বংশের রাজত্বকাল থেকেই চীনে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়েছিল। কাও-ও-সু-র পুত্র সম্রাট তা'ই সুং ছিলেন দিগ্বীজয়ী ও সুশাসক। পরবর্তী সম্রাটদের মধ্যে কাও-সুং, সুয়ান সুর, সু-সুং প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন। কথিত আছে যে, ত্যাং আমলে চীন সাম্রাজ্য মহা-প্রাচীরের (চীনের প্রাচীর) উত্তর প্রান্তের ঘাঁটি থেকে দক্ষিণে আনাম-এর (বর্তমান ভিয়েতনামে অবস্থিত) সীমান্ত পর্যন্ত এবং পশ্চিমে তিব্বতের সীমান্ত থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এতটা বিশাল না হলেও ত্যাং সাম্রাজ্য সেকালের পৃথিবীর সব থেকে বড় সাম্রাজ্য ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ত্যাং বংশীয় সম্রাটগণ কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেন। তাঁদের সময় সামন্তগণকে মাথা তুলতে দেওয়া হত না। ত্যাং আমলে আইনসমুহ ঢেলে সাজান হয়েছিল। এই যুগের আইনগুলি ছিল অত্যন্ত উদার, যুক্তিপূর্ণ ও দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহারের উপযোগী। ত্যাং সম্রাটগণ লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সম্রাট তাই সুং নিয়ম করেন যে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। তাড়াহুড়ো করে এ দণ্ড দেওয়া যাবে না। দস্যুতা নিবারণের জন্য তিনি কঠোর আইন প্রবর্তন করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল, করভার লাঘব, প্রজাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা, সৎ কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি কাজ করলেই চুরি-ডাকাতি বন্ধ হয়ে যাবে। সম্রাট সুয়ান-সুং প্রাণদণ্ড তুলে দেন। তিনি আইন-আদালতেরও সুব্যবস্থা করেছিলেন। ত্যাং যুগে চীনে বসবাসকারী বিদেশীরা তাদের নিজেদের আইন অনুযায়ী শাসিত হত। এরকম উদার ব্যবস্থা বর্বর জার্মানগণ রোমানদের শাসন ব্যাপারে গ্রহণ করেছিল।

ত্যাং যুগে শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এসময় বিদ্যালয়গুলির সংস্কার করা হয়। শিক্ষণীয় বিষয়গুলির

মধ্যে ছিল কনফুশিয়স-এর নীতি-শাস্ত্র, ইতিহাস, আইন, অঙ্ক, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি।

ত্যাং আমলে দর্শন, বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতির উন্নতি হয়েছিল। ত্যাং যুগের একজন বিখ্যাত দার্শনিকের নাম হ্যান য়ু। এ যুগে সাহিত্যের নানা শাখায় অগ্রগতি দেখা যায়। সব থেকে উন্নতি হয়েছিল কাব্যে। কবিদের এ যুগে খুব সম্মান করা হত। তিন শতাব্দী কাল ব্যাপী ত্যাং যুগকে বলা হয় "কাব্যের স্বর্ণযুগ"। এ যুগে দশটি কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এগুলিতে ৪২০০ কবির ৪৯০০ কবিতা রয়েছে। এ সময়কার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন লি পো এবং তু ফু।

লি পো গর্ব করে বলতেন, তাঁর কবিতা পড়লে ম্যালেরিয়া সেরে যায়। এ যুগের অন্যান্য কবিদের মধ্যে মেং হো-যনে, য়ুয়ান চেন, পো চু-ই প্রভৃতিও বিখ্যাত ছিলেন। এ যুগে বহু ছোটগল্প ও কিছু নাটকও রচিত হয়েছিল। এসময়ের রূপকথাগুলিও ভারী সুন্দর।

চীনারা শুধু কাব্য, সাহিত্য, দর্শন নিয়েই ব্যস্ত থাকত না। ব্যবহারিক শিল্পেও তাদের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কাগজ তৈরী হয়। শীঘ্রই কাঠের ব্লক প্রস্তুত করে এই কাগজ ছাপার কাজ শুরু হয়। ত্যাং যুগে সর্বপ্রথম বই ছাপা শুরু হয়। এর ফলে শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের পথ প্রস্তুত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় এক হাজার অব্দে চীনে মুদ্রণশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হলেও ইউরোপে এর প্রসার ঘটে পঞ্চদশ শতকে। এ থেকে বুঝতে পারবে, চীন মধ্য-যুগে ইউরোপের তুলনায় কতটা এগিয়েছিল।

শিল্প ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও ত্যাং যুগের কীর্তি কম নয়। এ সময় চীনে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। চীনের উত্তরাংশের গুহা-মন্দিরগুলিতে অনেক অপূর্ব সুন্দর বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। এগুলি ছিল পাথরে তৈরী। এই মূর্তিগুলিতে ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। এ যুগে মৃৎ-শিল্পেরও চরম উন্নতি ঘটে। মাটির তৈরী মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মূর্তিগুলি একেবারে জীবন্ত বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ

এ যুগেই চীনামাটির বাসন তৈরী হতে থাকে। চীনা চিত্রশিল্পীরা মন্দিরের গায়ে সুন্দর সুন্দর চিত্র এঁকে রাখতেন। রেশম ও কাগজের ওপরও এ যুগে চমৎকার সব চিত্র আঁকা হত। ত্যাং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন উ তাও-জু। প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে তাঁর জুড়ি ছিল না।

ত্যাং যুগে চীনারা চা-এর নেশায় মেতে ওঠে। এ যুগের আগেই অবশ্য চীনে চা-এর প্রচলন ঘটেছিল। এ যুগের কবি-সাহিত্যিকরা চা-এর মহিমা কীর্ত্তন করতে কখনো ক্লান্তি বোধ করতেন না। একজন লেখকের কথায়, চা-পাতার ভাঁজ ষাঁড়ের গলার ঝুলন্ত চামড়ার মত কোঁকড়ানো, জলে ফেললে, সেই ভাঁজ মেলতে থাকে কুণ্ডলী পাকানো নদীর কুয়াশার মত…



ত্যাং যুগের শিল্প

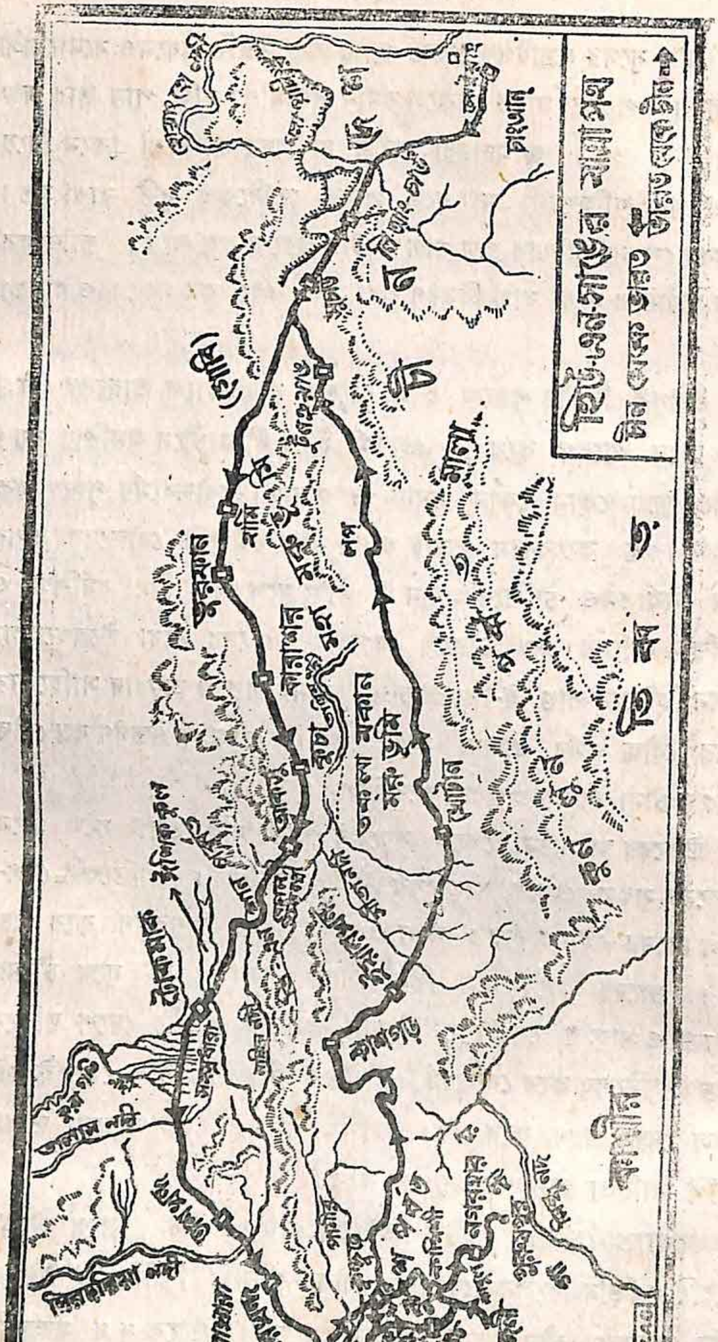
ত্যাং যুগে স্থলপথ ও জলপথে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বিদেশীরা চীনা দ্রব্যাদি বিশেষ করে রেশম, মশলাপাতি ও চীনা মাটির বাসন-কোসন কেনার জন্য পাগল ছিল। চীনের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ক্যান্টন বন্দরে বহু বিদেশী এসে ভিড় জমাত। লাভজনক বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে চীন এসময় অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

ত্য'াং যুগের সম্রাটগণ কৃষক ও কৃষির উন্নতিসাধনেও মনোযোগী ছিলেন। প্রজারা যাতে সকলে সমান পরিমাণ জমি পায় তার জন্য চেষ্টা করা হয়। জমিদাররা গরীব চাষীদের জমিজমা কিনে নিয়ে যাতে খুব শক্তিশালী না হতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হত। সরকার সেচের সুবিধার জন্য খাল কাটার সুবন্দোবস্ত করে। দুর্ভিক্ষের সময় চাষীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হত এবং কর মকুবেরও ব্যবস্থা ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হ্যান বংশের রাজত্বকালে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম চীনে প্রবেশ করে। এই ধর্ম ধীরে ধীরে চীনে জনপ্রিয় হয়। ত্য'াং যুগে কোন কোন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু কয়েকজন সম্রাট ও বহু রাজ কর্মচারী বৌদ্ধদের ওপর চরম নির্যাতনও চালিয়েছিলেন। ত্য'াং যুগে বহু চীনা ধর্মশিক্ষা ও তীর্থস্থান দর্শনের জন্য ভারতে যেতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হিউয়েন সাঙ, ই-সিং প্রভৃতি। চীনা শিল্প ও অনুবাদ সাহিত্যের ওপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

উপরের অলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, ত্যাং' যুগে চীনে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। প্রতিবেশী দেশ-গুলি চীনের এই অত্যুন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনুকরণ করে ধন্য হত। তাদের কাছে চীন ছিল আদর্শ দেশ। এই যুগে চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোরিয়া, জাপান, আনাম প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম ও উন্নত শিল্পরীতি চীন থেকেই এই সকল দেশ গ্রহণ করেছিল। জাপান চীনের শাসন-ব্যবস্থা, ভাষা, লিপিঁ, সাহিত্য প্রভৃতিও অনুসরণ করে।

বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙের কথা আগে উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গম স্থলপথে চীন থেকে ভারতে আসেন। তাঁকে ধূ ধূ মরুভূমি, তুষারে ঢাকা পাহাড়-পর্বত, বিশাল নদ-নদী, বিরাট অরণ্য, বর্বরদের



বাসভূমির প্রভৃতি পেরিয়ে জানা-অজানা পথ ধরে ভারতে আসতে হয়। লিআংচাউ, হামি, তুর্ফান, কুচা, টোকমাক, তাশখন্দ, সমরখন্দ, আফগানিস্তান হয়ে তিনি ভারতে আসেন। কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, টুনহুয়াঙ, সুচাউ হয়ে তিনি ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরে যান।

হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতে বিশ্বাসী ছিলেন। মহাযান মতে বিশ্বাসীরা বুদ্ধদেবের মূর্তি পূজা করে থাকে। মহাযান মতের মূল শাস্ত্রগুলি সংগ্রহ করার জন্য হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন। তিনি সমগ্রহ ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন। কনৌজের বিখ্যাত সম্রাট হর্ষবর্ধন, কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মা প্রভৃতি ছিলেন তাঁর একান্ত অনুরক্ত। হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধদের অসংখ্য তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন। মহাযান বিহারে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য শীলভদ্রের কাছে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে শিক্ষালাভ করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ প্রচুর বৌদ্ধ শাস্ত্র, মূর্তি ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি নিয়ে দেশে ফিরে যান। চীন-সম্রাট তা'ই স্থুং তাঁকে পরম সমাদারে গ্রহণ করেন। তাঁর অনুরোধে হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। ভারত থেকে নিয়ে আসা বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ-গুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করে হিউয়েন সাঙ তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। ৬০১ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁর মৃত্যু ঘটে ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।


হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভারত ভ্রমণের ফলে ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক যোগযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে

আরও কয়েকজন চীনা ভ্রমণকারী ভারতে এসেছিলেন। তিনি মোট ৭৫টি বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর ভারত-ভ্রমণের ফলেই মহাযান ধর্মমত ও যোগাচার দর্শন চীনে জনপ্রিয় হয়েছিল। যোগাচার দর্শন শীঘ্রই জাপানেও প্রচারিত হয়। হিউয়েন সাঙ বুদ্ধদেবের বহু মূর্তি চীনে নিয়ে আসায় চৈনিক শিল্পে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব পড়ে। তিনি ভারতে দীর্ঘকাল অবস্থান করায় ভারতীয়গণও চীনদেশ সম্পর্কে আগ্রহী হয়।

সুং যুগ (৯৬০-১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ) : ত্য'াং যুগের পতনের পর চীনে ৫০ বছরেরও বেশী সময় ধরে অরাজকতা চলে। শেষ পর্যন্ত সেনাপতি চাও কুয়াইয়িন চীনে যে রাজবংশ স্থাপন করেন তা' সুং বংশ বলে পরিচিত। সম্রাট চাও বা তাঁর বংশধরগণ সমগ্র চীন তাঁদের দখলে আনতে পারেননি। তাঁদের প্রধান কীর্তি রাজ্যজয়ে নয়, শান্তি স্থাপনে। তাঁদের আমলে কোন গণবিদ্রোহ হয়নি। এটি সুশাসনেরই প্রমাণ। তবে সুং সম্রাটগণ উত্তর-পশ্চিমের তুর্কী, উত্তর-পূর্বের খিতান ও কিন উপজাতিদের দমন করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত কিনগণ চীনের উত্তরাংশ কেড়ে নেয়। সুং সম্রাটগণ দক্ষিণাঞ্চল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। মোঙ্গল জাতির আক্রমণে সুং বংশের পতন ঘটে। সুং আমলে শাসন ব্যাপারে নানা প্রগতিশীল সংস্কার চালু হয়। এ সময় শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। প্রথমে এসো, প্রগতিশীল সংস্কার সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নিই।

প্রগতিশীল সংস্কার : সম্রাট সেন-সুং (১০৬৮-১০৮৫ খ্রীঃ)ছিলেন প্রগতিপন্থী। তিনি কনফুশিয়সপন্থী রক্ষণশীল মন্ত্রীদের সরিয়ে দিয়ে ওয়াং আন-সি নামে এক প্রগতিশীল ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। ওয়াং আন-সি ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি, কর ব্যবস্থা-প্রভৃতি নানা বিষয়ে বৈপ্লবিক সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। সম্রাট সেন সুং-এর শাসনকে তাই 'বৈপ্লবিক শাসন' বলা হয়ে থাকে।

ওয়াং আন-সি খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফসল তোলার সময় খাদ্যশস্যের দাম কমে যেত এবং চাষীরা বঞ্চিত হত।

এ সমস্যা দুর করার জন্য ওয়াং স্থির করেন যে, রাষ্ট্র চাষীদের উপযুক্ত দাম দিয়ে শস্য কিনে নেবে এবং মূল্যবৃদ্ধির সময় তা সঠিক দামে বিক্রির ব্যবস্থা করবে। চাষীরা রাজস্ব হিসাবে প্রদেশের শস্যগোলায় ফসল জমা দিত। ওয়াং এই শস্য রাজধানীতে না পাঠিয়ে প্রদেশেই বিক্রির ব্যবস্থা করেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে খাদ্যশস্য পাঠাবার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। খাদ্যশস্য ছাড়া আরও কয়েকটি দ্রব্য নিয়ে রাষ্ট্র একচেটিয়া ভাবে ব্যবসা চালাত।

চাষীরা মহাজনদের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ নিয়ে চাষ-বাসে টাকা খাটাত। ওয়াং স্থির করেন, সরকার শতকরা ৩৩·৩ সুদে চাষীদের ঋণ দেবে। তারা জমি বন্ধক রেখে চাষবাসের সময় ঋণ নেবে এবং তা পরিশোধ করবে ফসল তোলার পর।

সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে ওয়াং প্রজাদের বিত্তের মূল্য নির্ধারণ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিত্তের বিবরণ সরকারের কাছে দাখিল করতে বাধ্য ছিল। ওয়াং, এর ওপর নির্ভর করে বিত্তবানদের সম্পত্তির ওপর কর বসান। একে বর্তমান যুগের আয়-কর বলা যেতে পারে। দরিদ্রের ওপর করভার কমানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর সংস্কার কার্যের ফলে চীনাদের অশেষ উপকার হয়েছিল। রক্ষণশীলদের বিরোধিতার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই (১৮০৬ খ্রীঃ) এই সকল সংস্কারের অকাল মৃত্যু ঘটে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : সুং যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। এ যুগে প্রচুর বই ছাপা হওয়ায় শিক্ষা বিস্তারে খুব সুবিধা হয়।

সুং যুগে কনফুশিয়স-এর দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা করা হয়। এ যুগের সব থেকে বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন চু সি। তিনি সব ব্যাপারে মধ্যপথ অনুসরণ করতে বলতেন।

সুং যুগের কবিতা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এযুগে চলিত ভাষায় বহু চমৎকার গল্প লেখা হতে থাকে। এ যুগে বেশ কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থও রচিত হয়। সুংযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন জু মা-কুয়াং।

আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের নাম চে চিয়াও। এ যুগে কয়েকটি বিশ্বকোষও রচিত হয়। এগুলি ছিল নানা বিদ্যার সংগ্রহ। স্থং যুগে প্রাচীন সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, উদ্ভিদবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র সম্পর্কেও বহু বই রচিত হয়েছিল।

স্থং যুগের চিত্রকরগণ অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পশু-পাখীর চিত্র এঁকে বিখ্যাত হয়ে আছেন। এসময় রেশমে ও কাগজে ছবি আঁকা হত। এ যুগের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লি লুং মিয়েন, সিয়া কুয়েই প্রভৃতি। লি লুং মিয়েন ঘোড়ার ছবি খুব ভাল আঁকতে পারতেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

"লুং মিয়েনের মাথায় গজায়
ঘোড়া একটি হাজার,
মাংসপেশী অস্থি পাঁজর
আঁকে ভারি মজার।"

স্থং যুগের চীনা মাটির বাসন-কোসন ভারি সুন্দর হত। এগুলি ছিল খুব চকচকে। স্থং রাজারা দীর্ঘকাল ধরে চীনে শান্তি বজায় রেখেছিলেন বলেই সেখানে বিদ্যাচর্চা, শিল্প-সংস্কৃতির এত উন্নতি ঘটেছিল।

য়ুয়ান যুগ (১২৮০—১৩৬৮খ্রীঃ) ঃ মোঙ্গল জাতির নেতা কুব্‌লাই খান স্থং বংশের উচ্ছেদ সাধন করে চীন য়ুয়ান বংশ স্থাপন (১২৮০খ্রীঃ) করেন। নিশ্চয়ই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে, এই মোঙ্গলরা কারা? মোঙ্গলরা ছিল তুর্কী জাতির একটি শাখা। তারা চীনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান মোঙ্গলিয়া



কুব্‌লাই খান

এবং তার কাছাকছি অঞ্চলে বাস করত। যাযাবর মোঙ্গলরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ঘোড়ায় চড়তে তারা ছিল খুবই পটু। প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতার জন্য তারা কুখ্যাত হয়ে আছে। চেঙ্গিস খান নামে এক প্রতিভাবান নেতা মোঙ্গলদের সঙ্ঘবদ্ধ করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এশিয়া ও ইউরোপের এক বিরাট অংশ জুড়ে ছিল এর বিস্তার। কুব্‌লাই খান ছিলেন চেঙ্গিস খানের পৌত্র। কুব্‌লাই ১২৫৯ থেকে ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি তাঁর রাজধানী কারাকোরাম থেকে চীনে পিকিং-এ নিয়ে আসেন। কারাকোরাম ছিল রুক্ষ গোবি মরুভূমিতে অবস্থিত। চেঙ্গিস-এর পুত্র ওগোতাই-এর আমলেই চীনের স্থুং বংশের বিরুদ্ধে মোঙ্গলদের সংঘর্ষ শুরু হয়। কুব্‌লাই চীন দখল করে এই সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটায়। কুব্‌লাই খান কোরিয়ায় এক বিদ্রোহ দমন করেন। ব্রহ্মদেশ,



কুবলাই খান-এর সাম্রাজ্য ও মার্কোপোলোর ভ্রমণ পথ

জাভা, কাম্বোডিয়া (চম্পা) ও আনামে তিনি সাময়িক ভাবে সাফল্য লাভ করেছিলেন। শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড) তাঁর বশ্যতা স্বীকার

করে। কুব্‌লাই দু'বার চেষ্টা করেও জাপান দখল করতে পারেন নি। কুব্‌লাই খান বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেও দূরবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তাগণ প্রায় স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করতেন।

কুব্‌লাই খান একজন চীনা শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করায় তাঁর আচার-আচরণ মার্জিত হয়। তিনি চীনদেশ ও চীনের সভ্যতাকে নিজের বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি চীনাদের বিশ্বাস করতেন না। তাঁর হাতে কোটি কোটি চীনা প্রাণ হারায়।

কুব্‌লাই খানের রাজত্বকালে বহু সমৃদ্ধ নগর, রাস্তাঘাট, সরকারী শস্যগোলা প্রভৃতি নির্মিত হয়। সম্রাট বৃদ্ধ, পণ্ডিত এবং এবং অনাথ-আতুরদের খাদ্য বিতরণ করতেন। শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারেও তাঁর আগ্রহ ছিল।

কুব্‌লাই খান সমগ্র সাম্রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর ফলে স্থল ও জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুবই উন্নতি হয়। মোঙ্গল সম্রাট অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি নিজে ছিলেন তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত। এই ধর্মের অনুষ্ঠানাদি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। বিদেশী বণিক ও ভ্রমণকারীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার খুবই ভাল ছিল। তাঁর রাজত্ব-কালে ইটালীর ভেনিস নগরী থেকে মার্কো পোলো নামে এক তরুণ পর্যটক ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বাবা ও কাকার সঙ্গে স্থলপথে চীনে আসেন। তাঁকে কুব্‌লাই খানের খুবই পছন্দ হয়। সম্রাট তাঁকে হ্যাং-চৌ নগরের শাসক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রায় সতের বছর চীনে থাকার পর মার্কো পোলো জাভা, সুমাত্রা, দক্ষিণ ভারত ও পারস্য হয়ে ভেনিসে ফিরে যান (১২৯৫ খ্রীঃ)। দেশে ফিরে গিয়ে মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। শীঘ্রই তাঁর ভ্রমণ কাহিনী ইউরোপীয়দের এশিয়া মহাদেশ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে।

কুব্‌লাই খানের মৃত্যুর কিছু দিনের মধ্যেই য়ুয়ান বংশের পতন ঘটে। অতঃপর চীনে সিং বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

মার্কো পোলোর বিবরণ ঃ মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীর নাম ট্রাভেলস অব মার্কো পোলো। এই বইটিতে তিনি চীন, শ্যাম,



কুব্‌লাই খানের কাছে নতজানু মার্কোপোলো

জাভা, সুমাত্রা, সিংহল এবং দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে অনেক কথা লিখে গেছেন। তাঁর মতে চীনের নগরগুলি আয়তনে, লোক সংখ্যায় ও সমৃদ্ধিতে ইউরোপের নগরগুলি অপেক্ষা সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। চীনের নগরগুলি বিশাল বিশাল অট্টালিকা, সেতু, হাসপাতাল, বাগান, বাজার, গুদাম ঘর, সরাইখানা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। রাস্তাগুলি ইট বা পাথর দিয়ে বাঁধান, ড্রেন দিয়ে জল নিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা। রাস্তা দিয়ে সুন্দর নরনারী ও বড় বড় গাড়ী চলে, শহরে খাদ্যের পরিমাণ অফুরন্ত। রাজধানী পিকিং-এর শহর ও শহরতলী অপূর্ব। এতে ছিল

অসংখ্য দোকান ও সরাইখানা। কুব্‌লাই খানের প্রাসাদটির মর্মর পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাসাদটির জানালা কাঁচের, এর ছাদ নানা রঙের টালি দিয়ে তৈরী। দ্রুতগামী ঘোড়ার সাহায্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করা হত। এ কাজে প্রয়োজন হত দু'লক্ষ ঘোড়া এবং দশ হাজার ডাক ঘরের। ঘোড়াগুলি ২৪ ঘণ্টায় ৪০০ মাইল (৬৪০ কি. মি.) যেত। রাস্তার দু'পাশে দেখা যেত শস্যশ্যামল মাঠ, সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগর, রেশম ও অন্যান্য বস্ত্র বয়নের কারখানা, আঙুর বাগিচা, ফুল-ফলের বাগান, সরাইখানা প্রভৃতি। মার্কো পোলো আরও দেখেছেন, চীনারা রান্নার কাজে কয়লা ব্যবহার করে। তিনি চীনে একটি খ্রীষ্টান রাজ্য বা উপনিবেশও দেখেছিলেন। মার্কো পোলোর বিবরণে ব্রহ্মদেশের হস্তী বাহিনী এবং জাপানের অফুরন্ত স্বর্ণ ভাণ্ডারেরও উল্লেখ আছে।

মার্কো পোলো কুব্‌লাই খানের রাজত্বের শুধু সমৃদ্ধিই দেখেছেন। মোঙ্গল শাসনকালে চীনাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নি। এটি তাঁর বিবরণের প্রধান ত্রুটি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মধ্যযুগে জাপান

আদি মধ্যযুগে জাপ সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ● মিকাডো-র প্রাধান্য ● চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ● বৃহৎ পরিবারগুলির বিরোধিতা ● মিকাডো—উচ্চতম শিন্টো পুরোহিত এবং সার্বভৌম সম্রাট ● মিকাডোর দুর্বলতার কারণ ● শোগুন ব্যবস্থা ● সামুরাই ● বুশিডো।

চীনদেশের পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান দেশটি অবস্থিত। ইহা কয়েকটি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত—দেখতে অনেকটা বাঁকা চাঁদের মত। জাপানীরা তাদের দেশকে 'দাই নিপ্পন' বা সূর্য ওঠার দেশ বলে থাকে। পূর্ব দিকেই তো প্রথম সূর্য ওঠে, তাই না! জাপানের আদি নাম ইয়ামাটো। জাপানীরা মোঙ্গলীয় জাতিভুক্ত। সম্ভবতঃ তারা কোরিয়া থেকে জাপানে এসেছিল।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে জাপানের সমাজ কতকগুলি গোষ্ঠী বা উজি নিয়ে গঠিত ছিল। কতকগুলি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠত উজি। গোষ্ঠীগুলি ছিল বংশানুক্রমিক। প্রতিটি গোষ্ঠীর একজন করে বংশানুক্রমিক দলপতি ও দেবতা ছিলেন। গোষ্ঠীর সদস্যরা নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে চাষবাস, বয়ন, মাটির বাসন-কোসন তৈরী প্রভৃতির ভার নিত। কোন কোন উজি জাপানের অধিপতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। অন্যেরা কিছুটা স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। জাপানীরা তাদের অধিকারগুলিকে বংশানুক্রমিক বলে বিশ্বাস করত। তাদের সমাজে যোদ্ধারাই অভিজাত ও শাসক-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল। অশ্বারোহী যোদ্ধারা কৃষকদের ওপর কর্তৃত্ব চালাত। যুদ্ধ বা কূটনীতির সাহায্যে কোন কোন উজি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে অন্য উজিগুলিকে নিজেদের অধীনস্থ বলে মনে করত। এইভাবে সমাজ সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচে নানা স্তরে বিভক্ত হয়। জাপানের ইতিহাস প্রধানতঃ শক্তিশালী উজিগুলিরই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস। রাজা বা মিকাডো উজিগুলির ওপর কর্তৃত্ব করতেন। এই পদও ছিল একটি বিশেষ বংশের একচেটিয়া। মধ্য হোনশু-র ইয়ামাটো সমতলে ছিল এই বংশের বাসভূমি।

বড় বড় যোদ্ধাদের পরিবারগুলি প্রচুর জমির মালিক ছিল। জাপানের জমিদার বা সামন্ত পরিবারগুলি অভিজাত বংশীয় অশ্বারোহী অনুচর (নাইট) এবং সৈন্যবাহিনী পোষণ করত। অনুচর ও সৈন্যরা ছিল প্রভুর প্রতি খুবই অনুরক্ত। জমিদার বা ব্যারনগণ প্রায় স্বাধীন ভাবেই তাদের জমিদারী বা ম্যানর শাসন করত। তাদের অধীনস্থ নাইটগণ তাদের জমিদারীর বিভিন্ন অঞ্চল দেখাশুনো করত। সম্রাট বা মিকাডোর সামরিক শক্তি ছিল না বলে ব্যারনগণ তাঁকে তেমন আমল দিত না। সম্রাটের প্রধান সেনাপতি বা শোগুন শক্তিশালী হলে তারা শোগুনের কথা মেনে চলত। তিনিও ছিলেন পরাক্রমশালী সামন্ত। জাপানে ব্যারনদের বলা হত "বুকে" এবং তাদের সৈন্যরা 'বুশি' বা "সামুরাই" নামে পরিচিত ছিল। বড় বড় ব্যারনদের অধীনে ছিল বেশ কিছু ভ্যাসাল। সীমান্ত অঞ্চলের ব্যারনগণ ছিল কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল টাইরা ও মিনামোটো উপদল। এরা তীব্র সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত থাকত।

জমির ওপর করভার খুব বেশী ছিল বলে অল্প জমির মালিকগণ অনেক সময় বড় বড় রাজকর্মচারী বা জমিদারকে জমি দিয়ে দিত। এরপর তাদের অনুগত হয়ে তারা সেই জমিই চাষ করত। জমিদারদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ লেগেই থাকত। ধন-প্রাণ বাঁচাবার জন্যও অনেকে বড় জমিদারের আশ্রয় নিতে বাধ্য হত। এভাবেই বড় জমিদারী গড়ে ওঠে। ইউরোপের সামন্ত ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অধিকার ও কর্তব্য মোটামুটি আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু জাপানী সামন্ত ব্যবস্থায় আইনের কোন ভূমিকা ছিল না।

জাপানের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। চাষীরা জমিদারের জমি চাষবাস করত। উৎপন্ন ফসলের বেশীর ভাগ যেত জমিদার ও সামুরাইদের ভাগে। চাষীদের চা'ল তৈরী করার যন্ত্র হিসাদে দেখা হত। তাদের সুখ সুবিধার দিকে কোন লক্ষ্যই রাখা হত না। মধ্য যুগের জাপানে প্রথমদিকে চা'লই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। পরবর্তী কালে চা'লের পরিবর্তে ধাতুমুদ্রার ব্যবহার হতে থাকে। জাপানে

ধীরে ধীরে নগর-সভ্যতার উদ্ভব হয় বরং বণিকদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।

জাপানের সম্রাট মিকাডো সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সূর্য দেবীর সন্তান। সুতারাং তাঁকে দেবতার সম্মানই দেওয়া হত। জাপানে শিণ্টো ধর্ম প্রচলিত ছিল। প্রকৃতি পূজা ও পূর্ব পুরুষদের পূজা ছিল এই ধর্মের মূল কথা। এই ধর্মে জনগণকে দেবদেবী ও তাঁদের বংশধরদের শ্রদ্ধা করতে শেখায়। আনুগত্যের শিক্ষা দিত বলে এই ধর্ম যোদ্ধাদের খুবই প্রিয় ছিল। জাপানীরা প্রধানতঃ যোদ্ধার জাতি। তাই শিণ্টো ধর্ম সেদেশে খুবই জনপ্রিয়। শিণ্টো ধর্ম মিকাডোর মর্যাদা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। মিকাডো শিণ্টো ধর্মের প্রধান পুরোহিত বলে গণ্য হতেন। সুতরাং শাসন ব্যাপারে ও ধর্মে তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করতেন। তত্ত্বের দিক দিয়ে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল না। তিনি প্রায়ই কোন শক্তিশালী সামন্ত পরিবারের হাতে পুতুল হয়ে থাকতেন। বড় বড় সামন্তরা তাঁকে মানতে চাইত না। মিকাডোর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোন কোন রাজকর্মচারী তৎপর হয়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে শোটুকু টাইসি বহু সামন্ত ও গোষ্ঠী-পতিকে সম্রাটের অনুগত ভ্যাসালে পরিণত করেন। তিনি নানাভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর সমর্থকগণ মিকাডোকে দেশের সমস্ত জমির মালিক বলে ঘোষণা করেছিল। ধানজমি কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারবে না বলেও স্থির হয়। চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দেবারও চেষ্টা চলে। এই সংস্কারকগণ মিকাডোকে চীন সম্রাটের মতই শক্তিশালী করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি। শক্তিশালী সামন্ত-বংশগুলির কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া সম্ভব হল না। সামন্তরা সংস্কারকদের পদে পদে বাধা দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত স্থির হল সামন্তরা তাদের জমিজমা আগের মতই ভোগদখল করবে। তবে এখন থেকে তা,

করবে সম্রাটের নামে। এই সকল সামন্তদের নানা পদ ও উপাধি দিয়ে সম্রাটের অনুগত করে তোলারও চেষ্টা হল। কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী সামন্তদেরই প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করতে লাগল। সংস্কারকগণ প্রদেশগুলি থেকে বেশী অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করে মিকাডোকে শক্তিশালী করে তোলেন। তাঁদের সংস্কারের ফলে সামন্তগণ শেষ পর্যন্ত বেসামরিক সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত জাপানে সংস্কারকদের প্রাধান্য ছিল। মিকাডো তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা বেশী দিন ভোগ করতে পারেন নি। ফুজিয়ারা পরিবার দু'শ বছর ধরে মিকাডোকে ক্ষমতহীন করে রাখে। জাপানের প্রথম শোগুন (প্রধান সেনাপতি) য়োরিতোমো, তার বংশধরগণ এবং অন্যান্য শোগুনের শাসনকালেও সম্রাট প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

বংশানুক্রমিক উজিগুলির প্রতিপত্তি, রাজকর্মচারীদের নিষ্কর জায়গীর ভোগ এবং বৌদ্ধ মঠগুলির প্রচুর নিষ্কর বিষয়-সম্পত্তি সম্রাটের দুর্বলতার প্রকৃত কারণ ছিল। প্রচুর পরিমাণ জমি নিষ্কর হওয়ায় সম্রাটের আয় অত্যন্ত কমে যায়। শক্তিশালী জমিদারগণ নানা কৌশলে কর ফাঁকি দিত। কর আদায়ের জন্য সম্রাটের নিজস্ব কোন বাহিনী ছিল না। প্রভাবশালী বৌদ্ধ পুরোহিতদের হাতে রাখার জন্য সম্রাট তাঁদের প্রচুর জায়গা-জমি দান করতেন। এর ফলে তিনি আরও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ সম্রাটকে ভয় দেখতেও দ্বিধা করতেন না। মিকাডোর এই দুর্বলতার সুযোগেই বড় বড় সামন্ত পরিবারগুলি তাঁর অভিভাবক হয়ে ওঠে।

শোগুন ঃ আগেই বলেছি, সীমান্ত অঞ্চলের সামন্তগণ প্রধানতঃ দুটি দলে বিভক্ত ছিল (১) টাইরা এবং (২) মিনামোটো। এরা সর্বদা সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত থাকত। প্রথমে টাইরা উপদল জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত মিনামোটোই জয়ী হয়। বিজয়ী দলের অধিনায়ক য়োরিটোমো অত্যন্ত পরাক্রমশালী হওয়ায় মিকাডো ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে **'সেই-ই-তাই শোগুন'** বা বর্বরদমনকারী মহান সেনাপতি উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই উপাধি বংশানুক্রমিক ছিল। প্রায় সাতবছর ধরে বিভিন্ন পরিবারের শোগুনগণ জাপানের শাসন কার্য পরিচালনা করেছিলেন। অনেক সময় আবার শক্তিশালী কর্মচারীরা শোগুনকে সামনে রেখে নিজেরাই শাসন কার্য চালত। সম্রাট শুধু নামেই সম্রাট ছিলেন।

সামুরাই: জাপানের যোদ্ধাদের সামুরাই বলা হত। তারা বুশি নামেও পরিচিত ছিল। সামুরাইগণ জমিদারদের হয়ে যুদ্ধ করত। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার ভারও ছিল তাদের ওপর। শান্তির সময় তারা আলস্যে দিন কাটাত। জমিদারগণ তাদের ভরণ-পোষণের ভার নিত।

জাপানী শিভাল্‌রী: তোমরা ইউরোপের সামন্ত ব্যবস্থায় শিভাল্‌রী-র কথা পেয়েছ। জাপানের যোদ্ধারও কতকগুলি নীতি মেনে চলত। এর নাম ছিল বুশিদো। তারা প্রভুর অত্যন্ত অনুগত থাকত। পারিবারিক বন্ধনকেও তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখত। দুঃখ-দুর্দশা বা মৃত্যু তাদের মোটেই বিচলিত করত না। বুশিদো ছিল জাপানী যোদ্ধাদের বীরধর্ম।

চীনের সহিত সম্পর্ক: অতি প্রাচীন কাল থেকেই চীনের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোরিয়ার মধ্য দিয়ে জাপানে প্রবেশ করে। জাপান, চীন থেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই ধর্ম চীনে প্রবেশ করে। জাপান চীন থেকে ভাষা, লিপি, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস রচনা, রাষ্ট্রনীতি, শাসনব্যবস্থা, শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু জাপানীরা সব বিষয়ে চীনাদের হুবহু নকল করেনি। তারা নিজেদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী সেগুলি পাল্টে নেয়। চীনে একটি কঠিন পরীক্ষায় পাশ করার পর কর্মচারী নিযুক্ত করা হত। সুতরাং সেখানে কর্মচারীরা বংশানুক্রমিক ছিল না। জাপানে ঐ ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে কর্মচারীরা ছিল বংশানুক্রমিক। জাপানী সংস্কারকগণ শত চেষ্টা করেও জাপ সম্রাটকে চীনা সম্রাটের মত ক্ষমতাশালী করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা জাপানের

পরিস্থিতির সাথে আপস করতে বাধ্য হয়েছিল। অপরের জিনিস যা ধ্যান ধারণাকে আত্মস্থ করে সেগুলিকে নিজের মত করে রূপ দেওয়াই জাপানী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

কালপঞ্জী

চীন

	৬১৮—৯০৭	ত্যাং বংশ
	৬২৯	হিউয়েন সাঙের ভারতে আগমন
	৬৪৯	হিউয়েন সাঙের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
	৬৬৪	হিউয়েন সাঙের মৃত্যু
	৯৬০ – ১২৮০	সুং যুগ
	১৫৫৯—১২৯৪	কুব্‌লাই খান
	১২৭৫	মার্কোপোলোর চীনে আগমন
খ্রীষ্টাব্দ	১২৯৫	মার্কোপোলোর ভেনিসে প্রত্যাবর্তন
	১২৮০—১৩১৮	য়ুয়ান যুগ
		জাপান
	ষষ্ঠ শতক	জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ
	সপ্তম-অষ্টম শতক	মিকাডোকে শক্তিশালী করার চেষ্টা
	১১৯২	প্রথম শোগুন নিযুক্ত

সারসংক্ষেপ—দীর্ঘকাল ব্যাপী অরাজকতার পর ত্যাং যুগে চীনে জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে এই যুগে শিক্ষা, আইন, সাহিত্য, ধর্ম, মুদ্রণ শিল্প, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে চরম উন্নতি দেখা গিয়েছিল। চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী ও পর্যটক হিউয়েন সাঙ ত্যাং যুগেই ভারতে এসেছিলেন। চীনের সুং যুগ নূতন ধরনের বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য

বিখ্যাত হয়ে আছে। মোঙ্গল য়ুয়ান বংশের রাজত্বকালে চীন লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তবে এই সমৃদ্ধি ভোগ করত বিদেশী শাসক মোঙ্গলগণ। চীনাদের নানা অত্যাচার সহ্য করতে হত। য়ুয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কুব্‌লাই খান। তাঁর চরিত্রে বহু গুণ ছিল। তাঁর রাজত্বকালে ভেনিসের পর্যটক মার্কোপোলো চীনে এসেছিলেন। মার্কোপোলোর ভ্রমণকাহিনী অতিশয় মূল্যবান।

মধ্যযুগীয় জাপানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতি চালু ছিল। বংশানুক্রমিক সামন্ত পরিবারগুলি ছিল প্রায় স্বাধীন। সম্রাট নানা কারণে দুর্বল ছিলেন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী সামন্ত পরিবারগুলির হাতের পুতুল। জাপানের উপর চীনের প্রভাব ছিল সুগভীর। জাপানে সামন্তবর্গ এবং তাদের অধীনস্থ নাইট ও সৈন্যগণ সমস্ত রকম আরাম-আয়েস ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তারাই ছিল অধিকাংশ জমির মালিক। বৌদ্ধ মঠগুলিও বেশ শক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন ছিল। কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। নাইটগণ বীরধর্ম পালন করত।

অনুশীলনী

১। ত্যাং যুগের চীনা সাম্রাজ্যের পরিধি সম্পর্কে কি জান?
২। ত্যাং সম্রাটদের রাজধানী ও দু'জন সম্রাটের নাম কর।
৩। ত্যাং বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে লেখ।
৪। ত্যাং যুগের আইন সংস্কার সম্বন্ধে লেখ।
৫। ত্যাং যুগের কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।
৬। ত্যাং যুগের ভাস্কর্য সম্পর্কে কি জান?
৭। ত্যাং যুগের শিল্প সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।
৮। ত্যাং যুগে চা-এর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কি জান?
৯। ত্যাং যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।
১০। ত্যাং যুগে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের কি অবস্থা ছিল?
১১। ত্যাং যুগে চীন কি ভাবে প্রতিবেশী দেশগুলিকে প্রভাবিত করে?
১২। হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণের গুরুত্ব কি ছিল?
১৩। হিউয়েন সাঙ কোন্ পথে ভারতে আসেন ও ফিরে যান?
১৪। সুং যুগের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলির যে কোন দুটি সম্পর্কে লেখ। সংস্কারগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি কেন?

১৫। স্থং যুগের শিল্প সম্পর্কে কি জান?

১৬। মোঙ্গলদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? তাদের সম্পর্কে লেখ।

১৭। মোঙ্গল সম্রাট কুব্‌লাই খান-এর রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে কি জান?

১৮। কুব্‌লাই খান-এর শাসন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ। চীনাদের প্রতি তিনি কিরূপ ব্যবহার করতেন?

১৯। মার্কোপোলোর বিবরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

২০। জাপান দেশটি কোথায় অবস্থিত? জাপানের আদি নাম কি ছিল? "নিপ্পন" কথাটির অর্থ কি? উজি বলতে কি বোঝ?

২১। "মিকাডো" কার উপাধি ছিল? শিন্টো কি? এটি কি শিক্ষা দিত? শিন্টোর সঙ্গে মিকাডোর কি সম্পর্ক ছিল?

২২। জাপানে সামন্তগণের সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। তারা মিকাডোকে আমল দিত না কেন?

২৩। মিকাডোর দুর্বলতার কারণ কি? মিকাডোকে শক্তিশালী করার জন্য কি চেষ্টা হয়েছিল? এর ফল কি হয়?

২৪। শোগুন কি? প্রথম শোগুনের নাম কি ছিল? শোগুনগণ কতদিন ধরে জাপানে শাসন চালান? মিকাডোর অবস্থা তখন কেমন ছিল?

২৫। চীনের সঙ্গে জাপানের কি ধরনের সম্পর্ক ছিল? জাপান চীন থেকে কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করে?

২৬। বুশিদো সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

২৭। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) ত্যাং যুগ কখন থেকে কখন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? (খ) ত্যাং যুগের একজন কবির নাম কর। (গ) হিউয়েন সাঙ কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন? (ঘ) স্থং যুগের অবসান কবে ঘটে? (ঙ) চীনে কে নূতন ধরনের শাসন সংস্কার চালু করেছিলেন? (চ) চীনের বিশ্বকোষ সম্পর্কে কি জান? (ছ) য়ুয়ান বংশ কে চীনে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ) কুব্‌লাই খান কোন্ ধর্মমত বিশ্বাস করতেন? (ঝ) জাপানের সমাজ ও অর্থনীতি কোন্ ধরনের ছিল? (ঞ) বৌদ্ধধর্ম জাপানে কখন প্রবেশ করে? (ট) প্রথম শোগুন কবে নিযুক্ত হন? (ঠ) শোগুন কথাটির অর্থ কি? (ড) জাপানী যোদ্ধাদের কি বলা হত? (ঢ) জাপানী বীরগণ যে নীতি অনুসরণ করত তার নাম কি? (ণ) জাপানী চাষীদের অবস্থা কেমন ছিল? (ত) ওয়াং সম্পত্তির ওপর যে কর বসান তাকে বর্তমানে কি বলা যেতে পারে? (থ) জাপানের অর্থনীতি কিসের ওপর নির্ভরশীল ছিল?

মধ্যযুগে ভারত

প্রথম পরিচ্ছেদ : গুপ্তসাম্রাজ্যের অবক্ষয়

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনে হুনদের ভূমিকা ◎ হর্ষবর্ধন ◎ হিউয়েন সাঙের বিবরণ ◎ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমরা গুপ্ত সম্রাটের কীর্তি-কাহিনী জেনেছি। হুনদের আক্রমণের ফলে যে এই বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ শতকে এর পতন ঘটে—সে কথা আগে বলেছি। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কথা বলতে গিয়ে হুনদের কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। চতুর্থ-পঞ্চম শতকে হুনরা নানা কারণে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাবুল দখল করে তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। ভারতে প্রবেশকারী হুনরা শ্বেত বা সাদা হুন নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ তারা তুর্কী জাতীয় ছিল। শ্বেত হুনরা প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত গান্ধার রাজ্যটি দখল করে। শীঘ্রই (৪০৮ খ্রীঃ) তারা গুপ্ত সাম্রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ায় গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫—৪৬৭ খ্রীঃ) তাদের বাধা দেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তিনি হুনদের নিদারুণ ভাবে পরাজিত করেন। এরপর প্রায় ৫০ বছর ধরে হুনরা আর ভারতমুখো হয় নি।

হুনরা স্কন্দগুপ্তের কাছে পরাজিত হবার পর পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে হুনগণ রোমান সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছিল। চতুর্থ-পঞ্চম শতকে হুনগণ চীনের উত্তরাঞ্চল অধিকার করে সেখানে রাজত্ব করতে থাকে। তাদের লুঠপাটের ফলে চীনের দক্ষিণাঞ্চলেরও নিদারুণ ক্ষতি হয়। পঞ্চম শতকের শেষ দিকে বা ষষ্ঠ শতকের প্রথমে হুনগণ আবার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। হুননায়ক তোরমাণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশের একাংশ দখল করেন। মালবও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তোরমানের পুত্র মিহিরগুল বহু ভারতীয় রাজাকে কর দিতে বাধ্য করেন। কাশ্মীর, গান্ধার, পাঞ্জাব প্রভৃতি তাঁর রাজ্যভুক্ত

ছিল। তিনি গুপ্তসম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যকেও পরাজিত করেছিলেন। নরসিংহগুপ্ত অবশ্য শীঘ্রই মিহিরগুপ্তকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। এই হুনদের আক্রমণের ফলে গুপ্তসাম্রাজ্যের নিদারুণ ক্ষতি হয়। এই আক্রমণ কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ এই সুযোগে স্বাধীন হয়ে যায়।

মানুষের ইতিহাসে হুনদের স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাদের আক্রমণ চীন, পারস্য, গুপ্ত ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ ছিল। হুনদের চাপেই বর্বর জার্মানগণ রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে সেটির পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নেয়। এর ফলে প্রাচীন রোমান সভ্যতার প্রচণ্ড ক্ষতি হলেও রোমান ও জার্মানগণ মিলে এক নূতন প্রাণবন্ত সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। ভারতের রাজপুতগণ এই হুন ও অন্যান্য বিদেশী জাতির বংশধর। ভারতের স্বাধীনতা, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য রাজপুতগণ প্রচণ্ড সংগ্রাম করে। চীন ও ইউরোপেও হুনরা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

হর্ষবর্ধন : গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়। এগুলির মধ্যে থানেশ্বর (পূর্ব পাঞ্জাব), কনৌজ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ), মালব (পশ্চিম ভারত) ও গৌড় (উত্তর-পশ্চিম বাংলা) উল্লেখযোগ্য। থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ) এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর পিতার নান প্রভাকরবর্ধন। তিনি শীঘ্রই কনৌজ দখল করেন। কনৌজে তাঁর রাজধানী স্থাপিত হল। গৌড়রাজ শশাঙ্ক সাময়িক ভাবে হর্ষের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। হর্ষবর্ধন সাময়িক ভাবে কাশ্মীর, সিন্ধু ও গুজরাট দখল করেন। শশাঙ্ক ছিলেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একাংশের অধিপতি। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার অধিকাংশ, বিহার ও উড়িষ্যা হর্ষের অধিকারে আসে। গুজরাটের রাজা এবং কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা তাঁর অনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্য জয় করার জন্যও চেষ্টা করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁকে পরাজিত

করেন। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করা হর্ষের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। উত্তর ভারতের এক বড় অংশ নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কনৌজের পরবর্তী রাজন্যবর্গও প্রধানতঃ উত্তর ভারত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদীর নিকটবর্তী অঞ্চল এবং পূর্বে আসাম, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমে আবার সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হর্ষবর্ধন সুশাসক ছিলেন। শাসন কার্যের প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর লক্ষ্য ছিল। অপরাধীরা কঠোর শাস্তি পেত। তথাপি দেশে চুরি ডাকাতির কমতি ছিল না। হর্ষবর্ধন সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি হিন্দু ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। হর্ষবর্ধন খুব দানশীল ছিলেন। তিনি জ্ঞানীগুণী ও বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর দানে সমৃদ্ধ ছিল। হর্ষবর্ধন নিজেও ছিলেন কবি ও নাট্যকার। সুপণ্ডিত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙকে হর্ষবর্ধন সাদরে গ্রহণ করেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে যায়।



হর্ষবর্ধন

হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের কথা তোমাদের আগেই বলেছি। তাঁর ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁরই লেখা একটি গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এটির নাম সি-ইউ-কি।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ: হিউয়েন সাঙের সময় ভারতের গ্রাম ও শহরগুলিতে বেশ ঘন বসতি ছিল। এগুলি ছিল প্রাচীর ঘেরা। নীচু শ্রেণীর লোকেরা শহরের বাইরে বাস করত। শহরে ছোট-বড় বহু বাড়ী থাকত। সেখানকার রাস্তাগুলি আঁকা-বাঁকা ও অপরিষ্কার। গ্রামাঞ্চলে ধান, গম, ফলমূল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত।

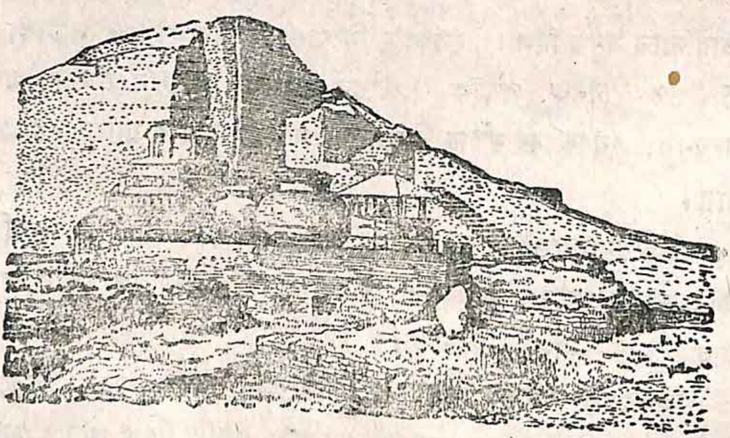
উঁচু শ্রেণীর লোকেরা পেঁয়াজ-রসুন খেত না। দুধ, মাখন, মাছ, মাংস, পিঠে, চিড়া, চিনি, সরষের তেল প্রভৃতি ছিল প্রধান খাদ্য।

ভারতীয়রা আস্ত কাপড় পরিধান করত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে সকলেরই বেশ নজর ছিল। সমাজে জাতিভেদ ছিল। গুরুজন ও ব্রাহ্মণদের খুব সম্মান করা হত। বিধবাদের আর বিয়ে হত না। সাধারণ লোক আমুদে, সৎ ও ধর্মভীরু ছিল। শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করা হত। মঠগুলিতে বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা ছিল।

রাজা সুশাসন ও ন্যায়বিচার করতেন। তিনি সামান্য কর নিতেন। কাউকে বিনা বিচারে খাটান হত না। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। অপরাধীদের সাজা ছিল অর্থদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ, কারাবাস প্রভৃতি।

ভারতে নানা বিদ্যার চর্চা হত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা ধর্ম প্রচলিত ছিল। মন্দির ও মঠের সংখ্যা ছিল অগুনতি। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে সম্রাট হর্ষবর্ধন ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ পূর্বভারতের বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বর্তমান বিহার প্রদেশে অবস্থিত ছিল। বিভিন্ন



নালন্দা

যুগে বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজা নালন্দায় বহু মঠ নির্মাণ করে দেন। এই মঠগুলি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সুউচ্চ মঠগুলি দেখতে ছিল অপূর্ব

সুন্দর। এগুলিতে হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী বাস করতেন। নালন্দার একটি মঠে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীটি ছিল অতি প্রকাণ্ড, উঁচু ও মনোরম। হিউয়েন সাঙের সময় নালন্দায় ১০ হাজার ছাত্র পড়াশুনো করত। ছাত্র ও শিক্ষকগণ বিনা ব্যয়ে এখানে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ পেতেন। ছাত্রদের কোন মাইনে দিতে হত না। রাজা-মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিরা তাঁদের ব্যয়ভার বহন করতেন। নালন্দার অধ্যাপকগণ অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। হিউয়েন সাঙ যখন নালন্দায় আসেন তখন এর অধ্যক্ষ ছিলেন মহাপণ্ডিত শীলভদ্র। তিনি বাঙালী ছিলেন।

কঠিন কঠিন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পারলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যেত না। এখানে অক্ষর পরিচয়, ব্যাকরণ, গদ্য-পদ্য রচনা, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান চলত। অসংখ্য মূল্যবান পুঁথি-পুস্তকে নালন্দার পাঠাগারটি সমৃদ্ধ ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় বহু বিদেশী ছাত্র এখানে পড়াশুনা করতে আসতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হর্ষবর্ধনের পরবর্তী যুগ

রাজপুতদের উত্থান ● বিভিন্ন রাজপুত বংশ।

৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু ঘটলে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। উত্তর ভারতে তখন দেখা দেয় অজস্র ছোট ছোট রাজ্য এবং তাদের মধ্যে অবিরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রাজপুতনা গুজরাট ও মালবের গুর্জর-প্রতীহারগণ এবং বাংলার পালবংশ হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ অধিকার করার জন্য দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজন্যবর্গ, কাশ্মীর ও তিব্বতের রাজারা সুযোগ পাওয়া মাত্র উত্তর ভারতের

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকেন। ওদিকে আরব মুসলমানগণ সিন্ধু ও মূলতান দখল করে নেয়। এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি সামন্ত-তান্ত্রিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এই গোষ্ঠীগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। এই রাজবংশগুলি রাজপুত নামে পরিচিত। বিভিন্ন যুগে শক, পহ্লব, কুষাণ, হুন প্রভৃতি বিদেশী যাযাবর জাতি উত্তর ভারতের নানা অঞ্চল দখল করে বসবাস করতে শুরু করে। কালক্রমে তারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দুদের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় রাজপুতগণ তাদের সঙ্গে মিশে যায়। এই মিশ্রণের ফলে যে সবল, প্রাণবন্ত ও দুঃসাহসী জাতির সৃষ্টি হয় তারই নাম রাজপুত। রাজপুতগণ অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে উত্তর ভারতের এক উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলমানদের অধীনে আসে। অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়টিতে ছিল এই রাজপুতবংশগুলির প্রাধান্য। যে অঞ্চলে তাদের আদি বাসস্থান ছিল তা রাজপুতানা নামে পরিচিত। বর্তমান রাজস্থান প্রদেশই রাজপুতানা। রাজপুত রাজ্যগুলি সম্পর্কে পরে আলোচনা করব। গুর্জর প্রতীহার ও পালবংশের অবিরাম সংগ্রামের কথা এখন একটু বিস্তারিতভাবে বলছি।

গুর্জর প্রতীহারগণ ছিল রাজপুত বংশীয়। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এরা রাজস্থান অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। গুর্জররাজ বৎসরাজ (আনুমানিক ৭৭৫-৮০০ খ্রীঃ) পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কনৌজ দখল করার উদ্যোগ করেন। এদিকে বাংলার পালবংশীয় রাজা ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৭৫-৮১২খ্রীঃ) বিহার অধিকার করে কনৌজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁদের উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল হর্ষবর্ধনের বিখ্যাত রাজধানী কনৌজ দখল করে উত্তর ভারতের সম্রাট হওয়া ; এইভাবে নবম শতকে এই দুই রাজবংশ রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রাম দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। বৎসরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু শীঘ্রই দাক্ষিণাত্যের

রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা ধ্রুব উত্তর ভারতে এসে বৎসরাজ ও ধর্মপাল উভয়কেই পরাজিত করেন। রাষ্ট্রকূটগণও বোধ হয় উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করতে চেয়েছিল। এইভাবে উত্তর ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করার জন্য গুর্জর-প্রতীহার, পাল ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে এক ত্রি-পাক্ষিক সংগ্রাম শুরু হল। ধ্রুবের নিকট পরাজিত হলেও পালরাজ ধর্মপাল পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করে কনৌজ অধিকার করেন। শীঘ্রই গুর্জর-প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট (আনুমানিক ৮০০-৮৩৩ খ্রীঃ) ধর্মপালকে পরাজিত করে কনৌজ দখল করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ সম্ভবতঃ ধর্মপালের অনুরোধে উত্তর ভারতে এসে নাগভট্টকে নিদারুণভাবে পরাজিত করলেন। গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপালও (আনুমানিক ৮২২-৮৫০ খ্রীঃ) গুর্জর-প্রতীহারদের পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু দেবপালের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে গুর্জর-প্রতীহারগণ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে মগধ ও বাংলার একাংশ কেড়ে নেয়। অবশ্য রাষ্ট্রকূটগণের আক্রমণের ফলে গুর্জর-প্রতীহার-গণের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং দ্বাদশ শতব্দীর প্রথম ভাগে গুর্জর-প্রতীহার ও পালবংশ দ্রুত পতনের দিকে অগ্রসর হয়। এসময় তুর্কী জাতীয় মুসলমানগণ উত্তর ভারতে বারবার আক্রমণ চালাতে থাকে। এদের বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব গিয়ে পড়ে ছোট ছোট রাজপুত রাজ্য ও তাদের করদ রাজ্যগুলির ওপর। এদের মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল রাজ্য, জব্বলপুর অঞ্চলের চেদি রাজ্য, মালবের পরমার রাজ্য, গুজরাটের চৌলুক্য রাজ্য, বারাণসীর গাহড়বাল রাজ্য এবং আজমীরের চৌহান রাজ্য বিখ্যাত। গুর্জর-প্রতীহার ও পালদের পর উত্তর ভারতে আর কোন ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি। শীঘ্রই মুসলমানগণ উত্তর ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের পত্তন করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলা

গৌড়রাজ শশাঙ্ক ● পাল ও সেনযুগে বাংলা

শশাঙ্ক : বাংলার পালবংশীয় রাজাদের কথা আগে কিছু কিছু বলেছি। আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শতাধিক বছর পূর্বে বাংলায় এক মহা শক্তিশালী রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম শশাঙ্ক (আনুমানিক ৬০০-৬২৫ খ্রীঃ)। হর্ষবর্ধন সম্পর্কে বলার সময় আমরা শশাঙ্কের উল্লেখ করেছি। ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড় বা উত্তর-পশ্চিম বাংলা স্বাধীন হয়ে যায়। স্বাধীন গৌড়ের একজন বিখ্যাত রাজার নাম ছিল গোপচন্দ্র। শশাঙ্ক স্বাধীন গৌড়রাজের অধীনে একজন সামন্ত ছিলেন। পরে তিনি নিজের বাহুবলে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন। সমগ্র বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার একাংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের উভয়ের শত্রু ছিলেন কনৌজের রাজা গ্রহবর্মা। এই গ্রহবর্মা ছিলেন থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনের ভগ্নীপতি। গ্রহবর্মা দেবগুপ্তের নিকট নিহত হন। এর কিছুদিন পর শশাঙ্ক কনৌজ দখল করায় থানেশ্বর-রাজ রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের উপক্রম হয়। শশাঙ্ক কৌশলে রাজ্যবর্ধনকে নিজের শিবিরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন। এর পর তিনি বাংলায় চলে যান। রাজ্যবর্ধনের ভাই হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হয়ে শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করেন। এ ব্যাপারে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা তাঁকে সাহায্য করেন। শশাঙ্ক সাময়িকভাবে হর্ষবর্ধনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি নষ্ট-ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর আমলে বাংলা সর্বপ্রথম উত্তর ভারতের রাজনীতিতে প্রতিপত্তি লাভ করে। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙের মতে, শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য না-ও হতে পারে। কারণ হিউয়েন সাঙ ছিলেন শশাঙ্কের শত্রু, হর্ষবর্ধনের সমর্থক। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরে। তিনি শিবের ভক্ত ছিলেন।

তাঁর স্বর্ণমুদ্রা বেশ উন্নত ধরনের ছিল। পরবর্তী কালে বাংলার পাল ও সেনরাজগণ শশাঙ্কের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

পাল ও সেন যুগে বাংলা : শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। এ ঘটনার পর একশ বছরেরও বেশী সময় ধরে বাংলাদেশে চরম অরাজকতা চলে। শেষ পর্যন্ত বাংলার জমিদার বা সামন্তগণ গোপাল নামে এক শক্তিশালী জমিদারকে বাংলার রাজপদে বসায়। গোপাল সমগ্র বাংলাদেশ দখল করে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তিনি বাংলায় যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তা-ই পালবংশ নামে পরিচিত। এই বংশ বাংলায় ৪৭০ বছরেরও বেশী সময় ধরে রাজত্ব করে। পালযুগে বাংলা ও বাঙালীদের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালীরা এসময় উল্লেখযোগ্য কীর্তির অধিকারী হয়। পাল রাজাদের মধ্যে গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮খ্রীঃ), রামপাল (১০৭৭-১১২০ খ্রীঃ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে পালবংশের পতন শুরু হয়। এই সুযোগে বাংলাদেশে নূতন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এর নাম সেন বংশ। সেন রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটে। সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিজয় সেন (আনুমানিক ১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ)। এই বংশের রাজাদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) এবং লক্ষণ সেন (১১৭৯-১২০৬ খ্রীঃ)। তুর্কী সেনাপতি ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন বখ্‌তিয়ার খল্‌জী লক্ষণ সেনের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ কেড়ে নেন (১২০৫ খ্রীঃ)। লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। তাঁর বংশধরগণ আরও কিছুকাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। সেনদের আমলেও বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল।

বাঙালীর জীবনযাত্রা ও সমাজ : পাল ও সেন যুগে জমিদার ও বণিকদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। কিন্তু চাষী ও শ্রমিকদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। 'তাঁদের হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপবাস'। অধিকাংশ বাঙালী গ্রামে বাস করত। চাষবাস; কাপড় বোনা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বাঙালীদের প্রধান জীবিকা। কামার, কুমোর, তাঁতী প্রভৃতির পৃথক পৃথক সঙ্ঘ ছিল। সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। কথিত আছে, সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। আচার, বিদ্যা প্রভৃতির নয়টি গুণের অধিকারীকে কুলীন আখ্যা দেওয়া হয়। পরে কুলীনত্ব বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়।

ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সব্‌জী, দুধ, ফলমূল, মুড়ি, খই, চিড়া, নারকোলের নাড়ু প্রভৃতি ছিল বাঙালীদের প্রধান খাদ্য। আহারের পর এক খিলি পান না হলে চলতনা। পুরুষেরা ধুতি এবং মেয়েরা শাড়ি ব্যবহার করত। সাজ-সজ্জার দিকে মেয়েদের ঝোঁক ছিল। পাশা, দাবা, কড়িখেল, নাচ-গান প্রভৃতি ছিল প্রধান আমোদ প্রমোদ।

সমাজে মেয়েদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। পর্দা প্রথা, বহু বিবাহ, পণপ্রথা, সতীদাহ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।

ধর্ম : পাল বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু তাঁরা অন্য ধর্মমতের প্রতি আদৌ বিরূপ ছিলেন না। তাঁদের বহু মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন হিন্দু। সেনরাজগণ ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁরা বৌদ্ধ প্রভাব থেকে হিন্দুদের মুক্ত করার জন্য বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পাল ও সেন যুগে অনেকে জৈনধর্মেও বিশ্বাসী ছিলেন। পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্ম তন্ত্র-ঘেঁষা হয়ে পড়ে। এই ধর্ম সহজিয়া ধর্মনামে পরিচিত। এটি ছিল একান্তভাবে গুরুর ওপর নির্ভরশীল। বৌদ্ধ গুরুদের মধ্যে লুইপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি বিখ্যাত।

বিদ্যাচর্চা : পাল ও সেনরাজগণ সংস্কৃত ভাষা ও বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ সময়ের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন দর্ভপাণি,

কেদার মিশ্র, ভট্টভবদেব, রাজা বল্লাল সেন, হলায়ুধ, সর্বানন্দ প্রভৃতি। পাল যুগের বৌদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকারের মধ্যে শান্তিদেব, জেতারি, অতীশ দীপঙ্কর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাল যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক চক্রপাণি দত্ত বহু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পাল ও সেন যুগের বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে অভিনন্দ, সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী, গোবর্ধন ও জয়দেব প্রসিদ্ধ। সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত'-এ কাব্য ও ইতিহাস দুই-ই পাওয়া যায়। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। চর্যাপদগুলিতে বাংলা ভাষার আদি রূপটি ধরা পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ঃ পালরাজগণ শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারের জন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজা গোপাল বা ধর্মপাল বর্তমান বিহারের উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুরে একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপন করেন। এখানে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও দর্শন শিক্ষা দেওয়া হত। এই মঠের গ্রন্থাগারটি ছিল প্রকাণ্ড। এখানে মেধাবী ছাত্রেরা বিনা বেতনে পড়াশুনো করত। এখানকার একজন বিখ্যাত অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য শীলরক্ষিত। রাজা ধর্মপাল বিক্রমশীল নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি মগধে (দক্ষিণ বিহার) বিক্রমশীল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিহারের ৩০০০ ছাত্রকে শিক্ষাদান করতেন ১১৪ জন অধ্যাপক। ছাত্র ও শিক্ষকগণ বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পেতেন। এই বিহারের সমস্ত ব্যয় বহন করতেন পালরাজগণ। এই বিহারের বিখ্যাত অধ্যক্ষদের মধ্যে বুদ্ধজ্ঞানপাদ, জেতারি, রত্নাকর, দীপঙ্কর প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। বহু তিব্বতী ছাত্র এখানে পড়াশুনা করতেন। পালরাজগণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহঃ চালুক্য, পল্লব ও চোল রাজ্য।

উত্তর ভারত সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতেও কয়েকটি বড় রাজ্য স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে বাদামীর চালুক্যরাজ্য, কাঞ্চীর পল্লবরাজ্য ও চোলরাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

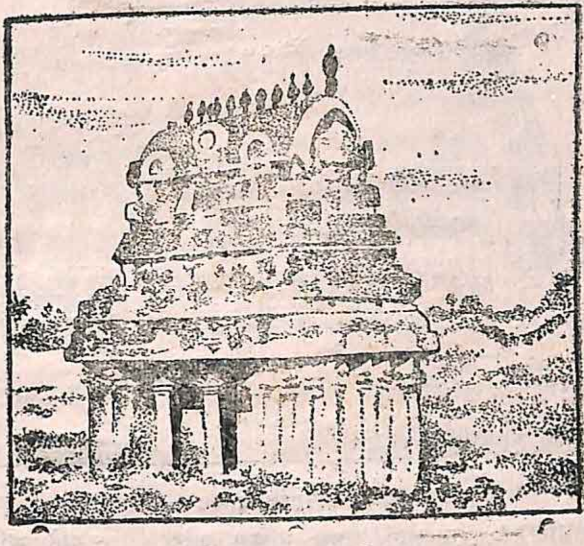
চালুক্যরাজ্যঃ চালুক্যগণ বোধ হয় কানাড়ী জাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে চালুক্য বংশীয় জয়সিংহ বাতাপি-র

(বিজাপুর জেলার বাদামী) কাছে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে প্রথম পুলকেশী ও কীর্তিবর্মণ ভাল যোদ্ধা ছিলেন। চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৯— ৬৪২ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। গুজরাট, মালব, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য এবং কেরল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশের সম্রাট হর্ষবর্ধন তাঁর নিকট পরাজিত হয়েছিলেন। পুলকেশী পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করে বেঙ্গী দখল করে নেন। তাঁর রাজ্য নর্মদা নদী থেকে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মণের হাতে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর সময় থেকেই চালুক্য-পল্লব সংগ্রাম শুরু হয়। এটি দীর্ঘ দিন ধরে চলেছিল। হিউয়েন সাঙ দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাক্রমের প্রশংসা করে গেছেন। পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য দীর্ঘ সংগ্রামের পর পল্লবদের কাছ থেকে চালুক্য রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তিনি পল্লব রাজধানী কাঞ্চী লুণ্ঠন করেছিলেন। পরবর্তী রাজা বিনয়াদিত্য কেরল, চোল, পাণ্ড্য, সিংহল এমনকি পারস্যের রাজাকেও পরাজিত করার দাবী করেছেন। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৩—৭৪৫ খ্রীঃ) কাঞ্চী দখল করেন। চোল, পাণ্ড্য ও কেরল তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তিনি আরবদের আক্রমণও প্রতিহত করতে পেরেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের আর একটি শক্তিশালী রাজবংশ রাষ্ট্রকূদের আক্রমণে চালুক্যরাজ্যের পতন ঘটে।

শিল্প ও স্থাপত্য ঃ চালুক্য রাজগণের আমলে শিল্প ও স্থাপত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এসময় অজন্তা গুহায় কয়েকটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই যুগে নির্মিত বিষ্ণুর ও শিবের দুটি বড় মন্দির অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। চালুক্য আমলে অজন্তার গুহাগাত্রে কিছু চমৎকার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছিল। চালুক্য আমলেই সর্বপ্রথম গুহা-গাত্র খোদাই করে গুহা-মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল।

পল্লব রাজ্য ঃ পল্লবগণের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন শিবস্কন্দ বর্মণ। তাঁর রাজধানী ছিল কাঞ্চীতে। ষষ্ঠ শতকে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু কাবেরী নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। পাণ্ড্য, চোল, চের

ও সিংহলের রাজারা তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। সিংহবিষ্ণুর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হয়ে বেঙ্গী প্রদেশটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র নরসিংহ বর্মণ (আনুমানিক ৬৩০—৬৬৮ খ্রীঃ) দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজধানী বাদামী দখল করে তাঁকে খুব সম্ভব হত্যা করেন। চোল, চের, পাণ্ড্য ও

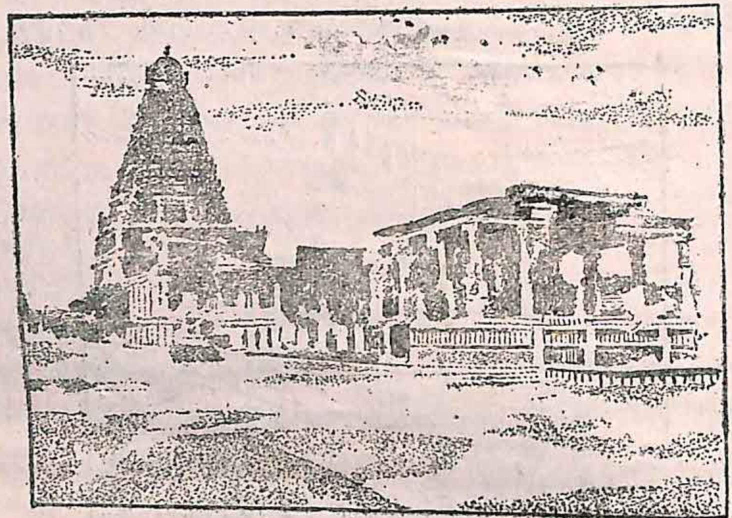


দক্ষিণ ভারতের মন্দির

কলভ্রগণও তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিল। এইভাবে দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সিংহলেও তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ পল্লবগণকে, সৎ, সত্যবাদী ও বিদ্যানুরাগী বলে প্রশংসা করেছেন। সপ্তম ও অষ্টম শতকে চালুক্যদের সঙ্গে পল্লবদের প্রায় বিরামহীন সংগ্রাম চলে। চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবরাজ প্রথম পরমেশ্বর বর্মণকে পরাজিত করেন। কিন্তু শীঘ্রই পরমেশ্বরবর্মন প্রথম বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করেছিলেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লব রাজাদের মোট তিনবার পরাজিত করেন। তিনি পল্লব রাজধানী কাঞ্চীও দখল করেছিলেন। পাণ্ড্য, রাষ্ট্রকূট ও চোলগণের আক্রমণের ফলে পল্লব রাজ্যের পতন ঘটে। এই বংশের শেষ রাজার নাম অপরাজিতবর্মণ।

শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পল্লবদের বিশিষ্ট দান আছে। পল্লব রাজারা পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণ করতে শুরু করেন। মন্দিরগুলি অপূর্ব সুন্দর প্রস্তরমূর্তি দিয়ে

সাজান ছিল। নরসিংহবর্মণ মহাবলীপুরম বা মামল্লপুরম-এ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর কেটে সাতটি প্যাগোডা বা রথ-এর আকৃতি বিশিষ্ট মন্দির নির্মাণ করেন। কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দিরও সুবিখ্যাত। পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের রীতি ভারতীয় রীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।



দক্ষিণ ভারতের মন্দির

চোলরাজ্য: চোলগণ সুদূর দক্ষিণ ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। চোলরাজ্যের সম্রাটদের মধ্যে রাজরাজ চোল (আনুমানিক ৯৮৫-১০১৪ খ্রীঃ) এবং প্রথম রাজেন্দ্র চোল (আনুমানিক ১০১৪-১০৪৪ খ্রীঃ) সব থেকে বিখ্যাত। তাঁদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর ছিল। চোলরাজগণ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এক বিশাল অংশ দখল করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। নৌবাহিনীর সাহায্যে তাঁরা মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, সিংহলের একাংশ, ব্রহ্মদেশের পেগু এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও অধিকার করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি এবং সুমাত্রা, জাভা ও মালয় উপদ্বীপের হিন্দুরাজ্যসমূহ নিয়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ বীর রাজেন্দ্র নৌযুদ্ধে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের পরাজিত করে সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের কিছু অংশ অধিকার করেন। বীর রাজেন্দ্রের উত্তরাধিকারীরা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই অঞ্চলে তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ

৪৫৫—৪৬৭	স্কন্দগুপ্ত
৪৫৮	হূনদল কর্তৃক গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ
৬০০—৬২৫	শশাঙ্ক
৬০৬—৬৪৭	হর্ষবর্ধন
৬০৯—৬৪২	দ্বিতীয় পুলকেশী
৬৩০—৬৬৮	প্রথম নরসিংহ বর্মণ
৭৩৩—৭৪৫	দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য
৭৭৫—৮০০	বৎসরাজ
৭৭৫—৮১২	ধর্মপাল
৮০০—৮৩৩	দ্বিতীয় নাগভট্ট
৮১২—৮৫০	দেবপাল
৯৮৫—১০১৪	রাজরাজ চোল
১০১৪—১০৪৪	প্রথম রাজেন্দ্র চোল
১০৭৭—১১২০	রামপাল
১০৯৫—১১৫৮	বিজয়সেন
১১৫৮—১১৭৯	বল্লালসেন
১১০৯—১২০৬	লক্ষ্মণসেন

সারসংক্ষেপ ● মধ্য এশিয়া থেকে আসা শক্তিশালী হূন জাতির আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে। হূনগণ চীন, পারস্য ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনেও সাহায্য করেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের এক বড় অংশ দখল করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন সুশাসক, দানশীল ও পরধর্মমতসহিষ্ণু। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য গুর্জরপ্রতীহার, পাল ও রাষ্ট্রকূটগণ এক ত্রিপাক্ষিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিন্তু কেহই উত্তর ভারতে স্থায়ী ভাবে প্রাধান্য স্থাপন করতে পারে না। শীঘ্রই বিদেশী আক্রমণকারীদের বংশধরগণ উত্তর ভারতের নানা স্থানে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এঁদের নাম 'রাজপুত'।

মধ্যযুগে বাংলার স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একাংশ দখল করেছিলেন। সাময়িক ভাবে কনৌজও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। পাল ও সেন যুগে বাংলায় সংস্কৃত ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পাল ও সেন যুগে ধনী ও মধ্যবিত্তরা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাত। কিন্তু চাষী ও মজুরদের অবস্থা ভাল ছিল না। পালযুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার হলেও এই ধর্ম তন্ত্র-ঘেঁষা হয়ে পড়ে। সেনযুগে বাংলায় বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ব্রাহ্মণদের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাল ও সেনরাজগণ শিক্ষাবিস্তারেও উৎসাহী ছিলেন। পালরাজ ধর্মপাল উদ্দণ্ডপুর এবং বিক্রমশীল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে চালুক্য, পল্লব ও চোলগণ শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। চালুক্য ও পল্লবগণ দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। চালুক্য ও পল্লবগণ শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। চোলগণ নৌবহরের সাহায্যে অনেক দ্বীপ এবং সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের একাংশ দখল করেছিল।

অনুশীলনী

১। হুনরা কখন গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে?

২। হুন আক্রমণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩। হর্ষবর্ধনের রাজ্য সীমা বর্ণনা কর।

৪। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের সম্পর্ক সম্বন্ধে কি জান?

৫। হিউয়েন সাঙের বিবরণ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে লেখ।

৬। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কি জান?

৭। কাদের রাজপুত বলা হয়ে থাকে? কয়েকটি রাজপুত রাজ্যের নাম কর।

৮। পাল, প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৯। শশাঙ্ক কোন্ কোন্ রাজ্য জয় করেছিলেন? তিনি কাকে হত্যা করেন? তিনি কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন?

১০। পাল ও সেন যুগে বাঙ্গালীর খাদ্য ও পোশাক সম্বন্ধে কি জান?

১১। পাল ও সেন যুগে বাঙ্গালীর আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে যা জান লেখ।

১২। পাল ও সেন যুগে দরিদ্রদের কেমন অবস্থা ছিল?

১৩। কৌলিন্য প্রথা সম্বন্ধে কি জান?

১৪। পাল যুগের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কি জান লেখ। সেনযুগে হিন্দু ধর্মে কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ?

১৫। উদ্দণ্ডপুর অথবা বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

১৬। বাদামীর চালুক্য রাজ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

১৭। কাঞ্চীর পল্লবরাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৮। চোলগণ নৌশক্তির সাহায্যে কোন্ কোন্ অঞ্চল দখল করেছিল ?

১৯। হাঁ বা না লেখ :—

(ক) কুষাণদের আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত হয়।

(খ) স্কন্দগুপ্ত হুনদের বিতাড়িত করেন।

(গ) ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়।

(ঘ) হর্ষবর্ধন দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হন।

(ঙ) নালন্দায় কেবল বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়ান হত।

(চ) শশাঙ্ক সামন্ত হিসাবে জীবন শুরু করেন।

(ছ) বিক্রমশীল একটি দানশালা।

(জ) গোপাল পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

(ঝ) পালবংশের প্রথম সম্রাট রামপাল।

(ঞ) কাঞ্চী পল্লবদের রাজধানী।

২০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) কনৌজ ছিল হর্ষবর্ধনের –

(খ) ত্রি-পাক্ষিক সংগ্রাম শুরু হয় পাল, — ও প্রতীহারদের মধ্যে।

(গ) মামল্লপুরমের — মন্দির বিখ্যাত।

(ঘ) বাদামীর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন —।

(ঙ) পালযুগের বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ছিলেন —।

(চ) চোলরাজ — শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন।

(ছ) একটি বিখ্যাত রাজপুত রাজ্যের নাম —।

(জ) তোরমানের পুত্র — বহু ভারতীয় রাজাকে কর দিতে বাধ্য করেন।

(ঝ) শশাঙ্ক ছিলেন —, বিহার ও উড়িষ্যার একাংশের অধিপতি।

(ঞ) সি-ইউ-কি রচনা করেন —।

(ট) শীলভদ্র ছিলেন — অধ্যক্ষ।

———

বিদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত ভারতের সম্পর্ক : মধ্যএশিয়া, চীন, তিব্বত, ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা, বলি, বোর্ণিও, কম্বুজ, চম্পা, সিংহল ● অতীশ দীপঙ্কর ● বরবুদুর ● অঙ্কোর বাত ● অঙ্কোর থোম।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলির রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। কণিষ্ক এবং তাঁর পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মত মধ্য এশিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মহাযানমতে বিশ্বাসীরা বুদ্ধদেবের মূর্তি পূজা করত। এই মত ছিল সহজ ও সরল। আর যারা মূর্তি পূজা না করে কেবল বুদ্ধদেবের মূল বাণীগুলিই অনুসরণ করত তাদের বলা হত হীনযানী। অশোক হীনযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। মধ্য এশিয়ায় মহাযানী ও হীনযানী—এই দু'মতেরই বহু বৌদ্ধ ছিল। হিউয়েন সাঙ মধ্য এশিয়ায় অসংখ্য মহাযানী বৌদ্ধ মঠ এবং মহাযানী বৌদ্ধ দেখেছিলেন। অবশ্য সেখানে হীনযানীদের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য ছিল না। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয়গণ বহু উপনিবেশ বা বসতি স্থাপন করে। খোটান ও তার চারদিকে এই সকল উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ খোটানের ভারতীয় রাজা বিজিত সিংহের উল্লেখ করে গেছেন। তুর্‌ফান, খোটান এবং খোটানের উত্তর দিকে অবস্থিত কুচা বা কুচী ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। হিউয়েন সাঙ কুচার ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখানে বহু বৌদ্ধশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষা থেকে এখানকার ভাষায় অনূদিত হত। ভারতীয় উপনিবেশগুলি বর্তমানে তক্‌লামাকান মরুভূমি বালির নীচে চাপা পড়ে গেছে। স্যর অরেলস্টাইন মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চল খনন করে অনেক শহর, বৌদ্ধস্তূপ ও মঠের ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং ভারতের ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। খোটান

অঞ্চলে আবিষ্কৃত মুদ্রা ও লিপিগুলির ভাষাও ভারতীয়। আফগানিস্তানে বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি পাওয়া গেছে। তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানে অনেক বৌদ্ধ স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের চেয়ে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়া থেকেই চীন প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই চীনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করে। অসংখ্য ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রচারক চীনে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মকে দৃঢ়মূল করেন। বহু চীনা তীর্থযাত্রী ও পণ্ডিতও ভারতে আসেন। চীন থেকেই জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের প্রথমদিকে ভারতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পূর্ব দিকের গিরিপথ পেরিয়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তিব্বতের রাজা স্রোঙ সান্ গোম্পো তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে উৎসাহ দেন। তিনি তিব্বতে ভারতীয় বর্ণমালাও প্রচলিত করেছিলেন।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান বৌদ্ধ পণ্ডিত। তিনি ছিলেন একাধারে গ্রন্থকার, ধর্মসংস্কারক ও পর্যটক। ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের এক রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর গুরু আচার্য শীল-রক্ষিত তাঁকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাম দিয়েছিলেন। ভারতে এবং ভারতের বাইরে বহু গুরুর কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষও হন। তিব্বতের এক রাজার অনুরোধে তিনি তিব্বতে গিয়ে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি মোট ১৬৮টি বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে 'বোধিপথ প্রদীপ' সুপ্রসিদ্ধ। অতীশ দীর্ঘ তের বছর ধরে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের সেবা করে ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ৭৩।

মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও

সংস্কৃতি স্থলপথে প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপগুলিতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে জলপথে। এসব অঞ্চলে ভারতীয়গণ উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করেছিল। প্রথমে ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এসকল দেশে যায়। পরে কিছু কিছু বণিক সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। শীঘ্রই তাদের প্রয়োজনে ভারত থেকে সেখানে পুরোহিত, কারিগর প্রভৃতি আনান হয়। কিছু ভাগ্যান্বেষীর দলও সেখানে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করে বসে।



বিদেশে ভারতীয় উপনিবেশ

ভারতের পূর্ব দিকে ব্রহ্মদেশ অবস্থিত। এটিকে প্রাচীনকালে "সুবর্ণভূমি" বলা হত। ব্রহ্মদেশের উপকূল অঞ্চলে ও তার অভ্যন্তরে বহু হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ফলে এদেশে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে। নিম্ন ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা মোন বা তেলৈং নামে পরিচিত। তেলৈং উপনিবেশগুলি ছিল হিন্দুভাবাপন্ন। এগুলিকে রমন্নদেশ বলা হত। তেলৈং অঞ্চলের উত্তরে ছিল পিউ রাজ্য। এটিও ছিল হিন্দু ভাবাপন্ন। আরাকানেও কয়েকটি ভারতীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। নবম শতকে মধ্য ব্রহ্মদেশে পাগান নামে একটি রাজ্য

স্থাপিত হয়। রাজা অনওরথ বা অনিরুদ্ধ-র (১০৪৪—১০৭৭ খ্রীঃ) আমলে এটি খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রায় সমগ্র ব্রহ্মদেশে তাঁর অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তিনি তাঁর রাজ্যে হীনযানী বৌদ্ধমত প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অনওরথ অসংখ্য বৌদ্ধ প্যাগোডা বা মঠ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর উৎসাহে ভারতের পালি ভাষা ও বর্ণলিপি ব্রহ্মদেশে প্রচলিত হয়েছিল। তাঁর পুত্রের আমলেও ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল। তিনি ভারতীয় উপনিবেশগুলির সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতেন।

মালয় উপদ্বীপ ভারতের কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে অনেকগুলি ভারতীয় উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এখানে বহু হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মধ্য যুগের প্রথম দিকে পশ্চিম ও মধ্য জাভায় এবং সুমাত্রায় ভারতীয়রা রাজ্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়। পরে পূর্ব জাভাতেও একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। জাভা যবদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। এদেশে হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা প্রবর্তিত হয়। এখানে রামায়ণ ও মহাভারতও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। জাতিভেদ প্রথাও এদেশে চালু হয়। যবদ্বীপের সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার গভীর প্রভাব পড়ে। পরবর্তীকালে এদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। যবদ্বীপে বহু হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ আছে। চতুর্দশ শতকে পূর্বজাভায় রাজসনগর নামে এক রাজা এক বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর সময় জাভা ও ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ছিল। অষ্টম শতকে মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা, বলি, বোর্ণিও এবং অন্যান্য পূর্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় সম্রাটগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের সাম্রাজ্য সুবর্ণদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। আরব লেখকগণ এই সাম্রাজ্যের বিশালত্ব ও নৌশক্তি সম্পর্কে অনেক কথা লিখে গেছেন। শৈলেন্দ্র বংশের আমলেই জাভায় বিখ্যাত বরবুদুর স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র সম্রাটগণ চোলদের সঙ্গে যুদ্ধে সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও তাঁরা তাঁদের হৃত

রাজ্যাংশ ও সম্মান শীঘ্রই পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন। ভারতের পাণ্ড্য দেশের এক রাজাও ত্রয়োদশ শতকে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। দক্ষিণ ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য রীতি এদেশের শিল্প ও স্থাপত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের রাজধানী ছিল দক্ষিণ সুমাত্রায় অবস্থিত শ্রীবিজয়।

বরবুডুরের বিশাল ও সুউচ্চ স্তূপটি শৈলেন্দ্রসম্রাটদের একটি অপূর্ব কীর্তি। এর নির্মাণ কৌশল এবং কারুকার্য অতুলনীয়। এই স্তূপটি



বরবুডুর

৭৫০ থেকে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরে ৪৩২টি অপূর্ব কারুকাজ করা বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। মূর্তিগুলিতে এবং ভাস্কর্যের অন্যান্য নমুনাতে ভারতের গুপ্তযুগের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই স্তূপের শিল্পকলার বিষয়বস্তু বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে নেওয়া হয়েছে।

কম্বোডিয়া বা কম্বুজদেশে প্রাচীনকালে একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। চীনারা একে বলত ফু-নান। ভারতীয় ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিণ্য ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। কৌণ্ডিণ্যের বংশধরগণ ইন্দো-চীনে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ রাজ্যের রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় জয়বর্মন, যশোবর্মণ, দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ, সপ্তম জয়বর্মণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যশোবর্মণ (৮৮৯-৯০০ খ্রীঃ) ছিলেন দিগ্বিজয়ী ও মহাপণ্ডিত। তিনি শ্যাম দেশ (থাইল্যাণ্ড) ও লাওস-এর ওপর তাঁর

আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি কম্বুপুরী বা **যশোধরপুর** নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে যশোধরপুরের একাংশে অঙ্কোর থোম নামে আর একটি বিশাল নগর নির্মিত হয়েছিল। যশোধরপুর নামে নগরটি ছিল বর্গাকার। এটি প্রাচীর ও পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল। নগরটির মধ্যভাগে ছিল এক বিশাল মন্দির। এটি পিরামিডের আকার বিশিষ্ট। এখানকার অট্টালিকাগুলিতে পল্লব স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায়।

দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ দ্বাদশ শতাব্দীতে **অঙ্কোরবাত**-এর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাণ করে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। এটি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। এই মন্দিরটি বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়। এই সুউচ্চ ও বিশাল মন্দিরটি পাথরের দেওয়াল ও চওড়া পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল। মন্দিরটির কারুকার্য অতুলনীয়। এর শিল্পকলার বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান ও ইতিহাসের নানা কাহিনী থেকে। মন্দিরের দেবমূর্তিগুলিও অতি সুন্দর।

কম্বুজ রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন সপ্তম জয়বর্মণ। তিনি দ্বাদশ শতকের দ্বিতায় ভাগে কম্বুজে রাজত্ব করতেন। তাঁর আমলে প্রায় সমগ্র ইন্দোচীন কম্বুজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। জয়বর্মণ **অঙ্কোর থোম** নামে একটি নূতন রাজধানী নির্মাণ করেন। নগরটি ছিল সুবিশাল। এটি উঁচু পাথরের দেওয়াল ও চওড়া পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল। নগরটিতে ছিল ৫টি বিশাল প্রবেশদ্বার। নগরটি ছিল বর্গাকার। এর প্রতিটি বাহু বা পাশ ৩·২ কিলোমিটার (দু' মাইল) দীর্ঘ। নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত বেয়ন-এর মন্দিরটি কম্বুজ স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অঙ্কোর থোমে অসংখ্য প্রাসাদ ও দেব-দেবীর মন্দির ছিল। রাজার অজস্র দানে মন্দিরগুলি ছিল সমৃদ্ধ।

সিংহল, শ্যামদেশ, বালি, বোর্ণিও, চম্পা (ভিয়েৎনাম) প্রভৃতি রাজ্যেও হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ	—পঞ্চম শতক	চীনে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচার
	—৭৫০—৮৫০	বরবুড়ুরের নির্মাণ
	—৮৮৯—৯০০	যশোবর্মণ
	—৯৮০—১০৫৩	অতীশ দীপঙ্কর
	—১০৪৪—১০৭৭	অনওরথ
	—দ্বাদশ শতক	দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ ও সপ্তম জয়বর্মণ

সারসংক্ষেপ ● মধ্যযুগে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, চীন, তিব্বত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশ ও দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারিত হয়। এই দেশগুলিতে ভারতীয়গণ উপনিবেশ ও রাজ্যও স্থাপন করে। অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন করেন। ব্রহ্মদেশে বেশ কয়েকটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয় বিখ্যাত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য। মালয়, জাভা, বলি, বোর্ণিও, চম্পা, কম্বুজ প্রভৃতি দেশেও হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। জাভায় বরবুড়ুর স্তূপ এবং কম্বুজ দেশে নির্মিত অঙ্কোর বাত মন্দির ও অঙ্কোর থোম নগর বিখ্যাত।

অনুশীলনী

১। খোটান ও কুচীতে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ব্যাপারে কি জান? ২। মহাযান ধর্মমত-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? বিদেশীরা কেন এটি সহজে গ্রহণ করত? ৩। চীনে কবে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়? এর ফলাফল বর্ণনা কর। ৪। অতীশ দীপঙ্কর সম্পর্কে কি জান? ৫। কোন্ দেশকে "সুবর্ণভূমি" বলা হত? এ দেশের কয়েকটি হিন্দু রাজ্য সম্পর্কে লেখ। ৬। অনওরথ সম্বন্ধে কি জান? ৭। সুবর্ণ দ্বীপ কাকে বলা হত? ঐ রাজ্যের রাজধানীর নাম কি? ভারতের সঙ্গে এর সম্পর্ক কেমন ছিল? ৮। বরবুড়ুর সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। ৯। অঙ্কোর বাত ও অঙ্কোর থোম কি?

১০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—

(ক) অতীশ দীপঙ্কর — খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। (খ) — ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক চিহ্ন পাওয়া গেছে। (গ) যশোধরপুর নগর নির্মাণ করেন —। (ঘ) বরবুড়ুর একটি —। (ঙ) —পৃথিবীর একটি বিস্ময়।

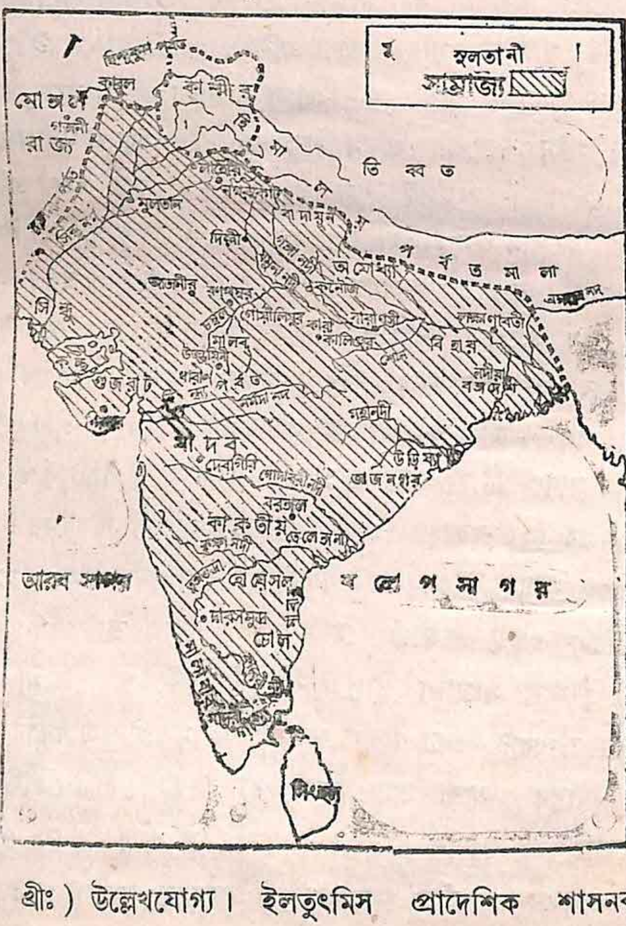
ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানগণ

তুর্কী জাতীয় মুসলমানগণের ভারত আক্রমণ ● সুলতান মামুদ ● মুহম্মদ ঘুরী ● দাসবংশ ● খলজী বংশ ● তুঘলক বংশ ● সৈয়দ বংশ ● লোদী বংশ ● সুলতানী আমলে সমাজ, অর্থনীতি ● হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ● ভক্তিবাদ ● স্বাধীন বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ● সুলতানী শাসন ব্যবস্থা।

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী খলিফারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে দেবার সংকল্প করেন। তাঁদের পরিচালনায় আরবের মুসলমানগণ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিরাট অঞ্চল দখল করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। তারা যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম দিকে ভারতের সিন্ধু ও মুলতান দখল করেছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। আরবগণ মধ্য এশিয়ার তুর্কীদেরও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। নবদীক্ষিত তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে আরবদের থেকেও বেশী উদ্যোগী হয়। দশম শতকের শেষ ভাগে গজনীর সুলতান সবুক্তিগীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত হিন্দু শাহী বংশীয় রাজ্য বার বার আক্রমণ করতে থাকেন। গজনীরাজ্য আফগানিস্তানে অবস্থিত ছিল। সবুক্তিগীনের ভারত আক্রমণের দুটি উদ্দেশ্য ছিল: (১) ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করা এবং (২) ভারতের প্রতিমা-পূজায় অভ্যস্ত হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা। তাঁর পুত্র দিগ্বীজয়ী সুলতান মামুদ (৯৯৮—১০৩০ খ্রীঃ) একই উদ্দেশ্যে মোট সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তবু আক্রমণের সুবিধার জন্য তিনি পাঞ্জাব ও মূলতান অধিকার করেছিলেন। মামুদ অসংখ্য ভারতীয়কে হত্যা করেন, কোটি কোটি টাকা মূল্যের জিনিসপত্র স্বদেশে নিয়ে যান এবং বহু গ্রাম, মন্দির ও বিগ্রহ ধূলিসাৎ করে দেন। তাঁর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে ভারতবাসীর

আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মামুদের আক্রমণের প্রায় দেড়শ' বছর পর গজনীর ঘুর বংশীয় তুর্কী শাসক মহম্মদ ঘুরী (১১৭৩-১২০৬ খ্রীঃ) উত্তর ভারতে একটি বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করেন। মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি কুতব্‌উদ্দীন আইবক (১২০৬-১২১০ খ্রীঃ) দিল্লীতে স্বাধীন দাসবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এটিকে দাসবংশ বলার কারণ, কুতব্‌উদ্দীন এবং তাঁর কয়েকজন উত্তরাধিকারী প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। দাসবংশের সুলতানগণ ছিলেন তুর্কী জাতীয়। এই বংশের সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬ খ্রীঃ) রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রীঃ) এবং ঘিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৭



১২৮৭ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য। ইলতুৎমিস প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের

বিদ্রোহ দমন করে এবং মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে ভারতকে রক্ষা করে প্রশংসনীয় কাজ করেছিলেন। বলবন সুলতানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। দাস বংশের পতনের পর (১২৯০ খ্রীঃ) দিল্লীতে খল্‌জী বংশ (১২৯০-১৩২০ খ্রীঃ) স্থাপিত হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন খল্‌জী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)। তিনি উত্তর ভারতের অধিকাংশ ও সমগ্র দক্ষিণ ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি ভারতে সর্বপ্রথম জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেন। খল্‌জী বংশের পতনের পর দিল্লীতে তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খ্রীঃ) স্থাপিত হয়। এই বংশের উল্লেখযোগ্য সুলতান হলেন মহম্মদ বিন তুঘলক (১২৩৫-১৩৫১ খ্রীঃ) এবং ফীরুজ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রীঃ)। মহম্মদ বিন তুঘলক পণ্ডিত হলেও তাঁর বাস্তব বুদ্ধির একান্ত অভাব ছিল। ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের বহু প্রদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এই বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদের রাজত্বকালে সমরখন্দের তুর্কী জাতীয় সম্রাট তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে (১৩৯৮ খ্রীঃ) ধ্বংসের বন্যা বইয়ে দেন।



আলাউদ্দীন খল্‌জী



মহম্মদ বিন তুঘলক

তুঘলক বংশের পতনের পর দিল্লীতে সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১ খ্রীঃ) কিছুকাল রাজত্ব করে। তারপর দিল্লীর সিংহাসন লাভ করল আফগান লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ)। এই বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে কাবুল (আফগাস্তিানে অবস্থিত)-এর অধিপতি বাবর দিল্লী দখল করেন।

সুলতানী আমলে সুলতানই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শাসনব্যবস্থা ছিল সামরিক ধরনের। এতে জনগণের কোন ভূমিকা ছিল না। প্রায়ই বিদ্রোহ হত বলে দেশে শান্তি ছিল না। দুর্বল সুলতানগণ শক্তিশালী আমীরদের হাতের পুতুল ছিলেন। অধিকাংশ সুলতানই সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রজা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতেন। মুসলমানদের ক্ষেত্রে সুলতানগণ দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতেন এবং ন্যায্য বিচার করার চেষ্টা করতেন। আলাউদ্দীন খল্‌জী ও ফীরুজ তুঘলকের শাসন-সংস্কারের ফলে জনগণের কিছু উপকার হয়েছিল। সুলতানী আমলে সামন্ত ব্যবস্থা চালু ছিল। সামন্তদের ক্ষমতাবৃদ্ধি সুলতানী ব্যবস্থার পতনের একটি প্রধান কারণ।

সমাজ: সুলতাদী আমলে হিন্দু ও মুসলমানগণ সমাজে পাশাপাশি বাস করত। কিন্তু তাদের মধ্যে ধর্মীয় কারণে প্রচুর পার্থক্য ও মতভেদ ছিল। মুসলমান শাসকদের অনুগ্রহ লাভ করার জন্য অথবা তাঁদের চাপে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এর ফলে হিন্দুগণ আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার নীতি গ্রহণ করে। নারীর সম্মান রক্ষা করার জন্য বাল্য বিবাহ, পর্দা ও সতীদাহ প্রথার ব্যাপক প্রসার ঘটে। কিন্তু হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরে মেয়েদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ও অধিকার ছিল। দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানগণ ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি সহনশীল হয়।

অর্থ নৈতিক অবস্থা: সুলতানী আমলে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা ধরনের শিল্প ছিল জনগণের প্রধান জীবিকা। দু'একজন সুলতান ছাড়া কৃষির উন্নতির দিকে কেউ মনোযোগ দিতেন না। বণিকগণ মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর লাভ করত। শিল্পের মধ্যে বয়ন শিল্পই ছিল প্রধান। বিদেশে ভারতের সূক্ষ্ম বস্ত্রের খুব চাহিদা ছিল। দেশে

জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব সস্তা। কিন্তু টাকার অভাব থাকায় জনগণের অবস্থা ভাল ছিল না। ধনীরা অবশ্য বিলাস ব্যসনে ডুবে থাকত। কর-আদায়কারীরা প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাত।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক : সুলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলমানগণ ৩০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে পাশাপাশি বাস করে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই একে অন্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। হিন্দু সমাজ-সংস্কারকগণ মুসলমানদের প্রভাবে এক ঈশ্বরের আরাধনা, সহজ সরল পূজা পদ্ধতি, জাতিভেদ-হীন সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি চালু করেন। মুসলমান সুলতান ও আমীরগণও হিন্দুদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন। হিন্দুরাও মুসলমানদের ভাষা, পোশাক, আদব-কায়দা প্রভৃতি গ্রহণ করে। সুলতানগণ মসজিদ, প্রাসাদ, অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণের সময় হিন্দু মন্দিরের মাল-মসলা ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁদের ইমারতগুলিতে পারসীক ও হিন্দুস্থাপত্য রীতির সুন্দর মিশ্রণ দেখা যায়। শীঘ্রই হিন্দুগণ মুসলমান পীর বা ফকিরদের পূজা করতে থাকে। এভাবেই সতপীরের পূজা প্রচলিত হয়। মুসলমানগণও হিন্দুর পূজা পার্বণে যোগ দিতে থাকে। এইভাবে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। পার্সী বা ফার্সী ভাষা ও পশ্চিমা হিন্দীর মিশ্রণে গড়ে ওঠে এক নূতন ভাষা। এর নাম উর্দু। সুলতান ফিরুজ তুঘলক ও সিকন্দর লোদী কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ করিয়েছিলেন। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীন-এর উৎসাহে মহাভারত ও কল্হণের 'রাজতরঙ্গিনী' (কাশ্মীরের ইতিহাস) ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলার ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুদাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

ভক্তিবাদ : সুলতানী আমলে প্রধানতঃ হিন্দুদের মধ্যে এক সহজ সরল ধর্মমতের উদ্ভভ ঘটে। এর নাম ভক্তিবাদ। হিন্দু শাস্ত্রমতে মোক্ষ বা মুক্তি পাবার তিনটি পথ আছে : জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। সুলতানী আমলের হিন্দু সাধকগণ এই তৃতীয় পথটি বেছে

নিয়েছিলেন। এই সাধকগণের মধ্যে নামদেব, রামানন্দ, কবীর (আনুমানিক ১৪৪০-১৫১৮ খ্রীঃ), নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীঃ), চৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীঃ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁদের মূল বক্তব্য হল: সকল মানুষ সমান, সকলকে ভালবাসতে হবে এবং জটিল



শ্রীচৈতন্য



নানক



কবীর

পূজা-পদ্ধতির পরিবর্তে ভক্তিভরে ঈশ্বরকে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যাবে। এঁরা সকলেই ছিলেন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। নানক ও কবীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে সর্বপ্রথম প্রচার করেন। কয়েকজন মুসলমান ফকিরও এ ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। হিন্দু সাধকদের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি: (১) হিন্দুধর্মের

সংস্কার করে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার প্রবণতাকে রোধ করা এবং (২) হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষভাব কমিয়ে আনা। প্রথমটিতে প্রায় পূর্ণসাফল্যলাভ করেলেও দ্বিতীয়টির ব্যাপারে তাঁরা মাত্র আংশিক ভাবে সফল হয়েছিলেন।

বাংলা : মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে বাংলা স্বাধীন হয়ে যায়। বাংলার ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহীবংশ নানাভাবে এদেশকে সমৃদ্ধ করেছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের শমসুদ্দীন (১৩৪৬-১৩৫৯ খ্রীঃ) ও বরবক্ শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ) এবং হুসেন শাহী বংশের হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) ও নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) বিখ্যাত।

সমাজ : তুর্কী-আফগান যুগে বহু হিন্দু নানা কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দুসমাজেও নানারূপ শিথিলতা দেখা দেয়। এই বিপদ থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ হিন্দু সমাজে কতকগুলি কঠোর নিয়ম-কানুন চালু করেন। একই উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য সাম্য, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, কৃষ্ণের নাম-কীর্তন প্রভৃতি প্রচার করতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যের সহজ, সরল ধর্মমত হিন্দু সমাজকে নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে একত্রে বাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ হ্রাস পায়। হিন্দুরা মুসলমানদের পীর ও ফকিরদের শ্রদ্ধা জানাতে শুরু করে। মুসলমানগণও হিন্দু সাধু-সন্তদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। এইভাবেই বাংলায় সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা : এ সময় বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। আফ্রিকা থেকে আগত পর্যটক ইবন্ বতুতা বলে গেছেন যে, এই সময় বাংলায় বার পয়সায় একমণ চাল, প্রায় দেড় টাকায় একমণ ঘি বা চিনি ও তিন টাকায় একটি গরু পাওয়া যেত। বাংলার সূক্ষ্মবস্ত্র বা মসলিন বিদেশে খুব আদর পেত। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল খুবই লাভজনক। জমি উর্বরা বলে ফলনও খুব ভাল হত। কিন্তু এ সত্ত্বেও সাধারণ লোকের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।

সংস্কৃতি : বাংলার সুলতানগণ শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক

ছিলেন। এগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান রীতির মিশ্রণ দেখা যায়। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, একলাখা সমাধি, ষাট গম্বুজ প্রভৃতি এ যুগের স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বাংলার সুলতানগণ যোগ্য হিন্দুদের উচ্চপদে নিযুক্ত করতেন। সুলতানগণের উৎসাহে হিন্দু সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এ যুগে স্মৃতি ও ন্যায় বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীমদ্ভাগবতের আংশিক অনুবাদ, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের আংশিক অনুবাদ, শ্রীচৈতন্যের বহু জীবনীগ্রন্থ প্রভৃতি এ যুগেই রচিত হয়েছিল।

সুলতানী শাসনব্যবস্থা ঃ দিল্লীর সুলতানগণ স্বৈরাচারী হলেও নিজেদের ঈশ্বর এবং ধর্মগুরু খলিফার প্রতিনিধি বলে প্রচার করতেন। তাঁদের কোরানের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত। শাসন-ব্যাপারে উলেমাদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। উত্তরাধিকার বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট বিধি ছিল না। অভিজাতবর্গ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল। সুলতানের শক্তি নির্ভর করত তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর। উজীর বা প্রধান মন্ত্রী, ধর্ম, বিচার ও সামরিক বিভাগের কর্তারা তাঁকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন। প্রদেশগুলি আবার শাসন করতেন প্রাদেশিক শাসন-কর্তাগণ। প্রদেশগুলি আবার শিক, পরগণা ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। হিন্দুরাজাদের অধীনে কিছু করদ রাজ্যও ছিল। ভূমি-রাজস্ব, ধর্মীয়কর, লুণ্ঠিতসম্পদ প্রভৃতি ছিল আয়ের প্রধান উৎস। বিচারকদের কাজী বলা হত। দণ্ড বিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। কোটাল পুলিশের কাজ করত। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী পোষণ করত। অশ্বারোহী বাহিনীই ছিল সৈন্যবাহিনীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুলতানগণ হিন্দুদের প্রতি অধিকাংশ সময়েই ভাল ব্যবহার করতেন না। অথচ এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই সুলতানী ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল ছিল। একমাত্র ভরসা ছিল সামরিক বল। সেটি দুর্বল হওয়া মাত্র সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ

৯৯৮—১০৩০	সুলতান মামুদ
১১৭৩—১২০৬	মুহম্মদ ঘুরী
১২০৭—১২৯০	দাস বংশ
১২৯০—১৩২০	খল্‌জী বংশ
১৩২০—১৪১৩	তুঘলক বংশ
১৪১৪—১৪৫১	সৈয়দ বংশ
১৪৫১—১৫২৬	লোদী বংশ
	সাধক
১৪৪০—১৫১৮	কবীর
১৪৬৯—১৫৩৮	নানক
১৪৮৫—১৫৩৩	শ্রীচৈতন্য
	বাংলার স্বাধীন সুলতান
১৩৪৬—১৩৫৯	শম্‌সউদ্দীন ইলিয়াস শাহ
১৪৫৯—১৪৭৪	বরবক শাহ
১৪৯৩—১৫১৯	হুসেন শাহ
১৫১৯—১৫৩২	নসরৎ শাহ

সারসংক্ষেপ ● তুর্কী-আফগান মুসলমানগণ প্রথমে লুঠপাটের জন্যই ভারত আক্রমণ করে। পরে তারা এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়। ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তুর্কী-আফগানগণ দিল্লীকে রাজধানী করে ভারতে শাসন চালায়। খল্‌জী ও তুঘলক আমলে প্রায় সারা ভারত দিল্লীর অধীন হয়। কিন্তু শীঘ্রই সাম্রাজ্যের বৃহৎ অংশ স্বাধীন হয়ে যায়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলবীর বাবরের হাতে সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। দিল্লীর সুলতানগণ স্বৈরাচারী ও ধর্মান্ধ শাসক ছিলেন। তবে তাঁদের আমলে হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের কাছাকাছি আসে, হিন্দুধর্ম ও সমাজ সংস্কৃত হয় এবং সহজ, সরল ভক্তিবাদ প্রচারিত হতে থাকে। সুলতানগণের শিল্প ও স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলমান রীতির মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। এসময় কবীর, শ্রীচৈতন্য ও নানক প্রভৃতি সাধকের আবির্ভাব ঘটে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি হলেও সাধারণ লোকের

অবস্থা ভাল ছিল না। বাংলার ইলিয়াস শাহী ও হুসেনশাহী আমলে সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সুলতানদের শাসন ব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী ও সামরিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি ছিল জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্য থেকে বঞ্চিত।

অনুশীলনী

১। তুর্কী-আফগানদের ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল ?

২। দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? ইলতুৎমিস সম্পর্কে কি জান ?

৩। আলাউদ্দীন খল্‌জীর কীর্তির উল্লেখ কর।

৪। মহম্মদ বিন্ তুঘলকের কিসের অভাব ছিল ?

৫। সুলতানী যুগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৬। সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কি জান ?

৭। সুলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলমানগণ কি ভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল ?

৮। ভক্তিবাদ সম্পর্কে কি জান ?

৯। টীকা লেখ :

(ক) কবীর (খ) নানক (গ) শ্রীচৈতন্য।

১০। ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী আমলে বাংলার সমাজ সম্পর্কে কি জান ?

১১। ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী আমলের সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে লেখ।

১২। সুলতানী যুগের শাসন ব্যবস্থা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৩। সময়ানুক্রমে সাজাও :

লোদীবংশ, তুঘলকবংশ, দাসবংশ, খল্‌জীবংশ, সৈয়দবংশ।

১৪। কেন বিখ্যাত লেখ :—

১২০৬, ১২৯০, ১৩৯৮, ১৫২৬।

১৫। দু'এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) খলিফাদের পরিচালনায় আরবগণ কোন্ কোন্ দেশ দখল করে ? (খ) সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের গুরুত্ব কি ? (গ) ইলতুৎমিস সম্পর্কে কি জান ? (ঘ) ইবন্‌বতুতা বাংলার জিনিষপত্রের দাম সম্পর্কে কি বলে গেছেন ? (ঙ) সুলতানী শাসনব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল ছিল কেন ?

মধ্যযুগের অবসান পর্ব

কনস্ট্যান্টিনোপল-এর পতন ● রেনেসাঁ বা নবজাগরণ ● বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধি ● নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার ● উপনিবেশ স্থাপন ● ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ● মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ● শিল্পবিপ্লব ● জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র ● স্বৈরতন্ত্রের অবক্ষয় ● আধুনিক যুগ।

মধ্যযুগের দেশ-বিদেশের নানা কাহিনী এতক্ষণ তোমাদের শোনালাম। এবার কি করে মধ্যযুগের অবসান ঘটল সে বিষয়ে দু'চার কথা বলে নিই। চতুর্দশ শতক থেকেই মধ্যযুগের অবক্ষয় শুরু হয়। পঞ্চদশ শতকে এ যুগ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায় আধুনিক যুগে। দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টানগণ উন্নত সভ্যতার অধিকারী মুসলমান ও পূর্ব গ্রীক সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল। এর ফলে তারা যুক্তিবাদী গ্রীক বিদ্যার সন্ধান পায়। ধর্মকর্ম ছাড়াও যে জগতে অন্য ভাল জিনিস আছে, সে সম্পর্কে এই গ্রীকবিদ্যা ও মুসলমান সভ্যতাই তাদের সন্ধান দেয়। এর ফলে খ্রীষ্টানগণ কুসংস্কার-মুক্ত, উদার ও যুক্তিবাদী হতে থাকে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী মুসলমানগণ কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করে নিলে সেখানকার পণ্ডিতগণ ইটালীতে এসে আশ্রয় নেন। তাঁরা পশ্চিম ইউরোপের বাসিন্দাদের গ্রীক বিদ্যাশিক্ষা দিতে থাকেন। এর ফলে সেখানে আগেই যে সকল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তা আরও ব্যাপক হয়। এবার তারা নূতন করে জগৎ ও জীবনকে বুঝতে শেখে। এ সব কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। গ্রীকবিদ্যার ফলে ইউরোপীয়গণ অন্ধবিশ্বাসের বদলে যুক্তি, অনুসন্ধিৎসা, হাতে-কলমে পরীক্ষা করার প্রবণতা, অজানাকে জানার ইচ্ছা প্রভৃতি লাভ করে। এর ফলে তাদের জীবন ও কর্মধারা সম্পূর্ণ পালটে যায়। তারা নূতন উদ্যমে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝাঁপ দেয় এবং অপ্রত্যাশিত রত্নরাজি সংগ্রহ করে। ইউরোপীয়দের জীবন ধারার এই ব্যাপক পরিবর্তন ও সাফল্যকেই সাধারণতঃ রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বলা হয়ে থাকে। ইউরোপীয়গণ নূতন বিদ্যার প্রভাবে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, সাহিত্য ও শিল্পের

অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটায়, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে বহু নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করে এবং এই বিশাল বিশ্বের প্রতিটি অংশ দেখার জন্য বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে দিগ্বিদিকে বেরিয়ে পড়ে। এই সময়েই আবিষ্কৃত হয় কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, ছাপাখানা, বারুদ ও বন্দুক। কম্পাস জলপথে ভ্রমণ সহজ করে এবং ছাপাখানা জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করে। বারুদ ও বন্দুকের একচেটিয়া ব্যবহার রাজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ক'রে সামন্তদের ক্ষমতা চূর্ণ করার পথ প্রস্তুত করেছিল। তুর্কীরা কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করায় স্থলপথে এশিয়ার সঙ্গেই ইউরোপের বাণিজ্য পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পূর্বদিকের দেশগুলি থেকে সূক্ষ্মবস্ত্র, বিলাসদ্রব্য ও মশলাপাতি আনার জন্য ইউরোপীয়রা জলপথে ঐসব দেশে যাবার জন্যে উদ্যোগী হয়। এর ফলে আবিষ্কৃত হয় আমেরিকা, আফ্রিকা ও বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে পৌঁছুবার জলপথও জেনে গেল তারা। নূতন নূতন দেশে স্থাপিত হল ইউরোপীয়দের উপনিবেশ। সেখান থেকে নিজেদের দেশে প্রচুর কাঁচামাল, সোনা-রূপা প্রভৃতি পাঠান শুরু হল। নূতন বাণিজ্য-পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় আটল্যান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ বাণিজ্য করে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠল। এই বণিকগণই গড়ে তুলল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বাণিজ্যের প্রসার ও উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন উর্বর ও খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করার জন্য তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। শুরু হল এই সকল দেশে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সম্প্রসারণ। অধিকৃত দেশগুলিতে বিক্রয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণ সামগ্রী তৈরীর প্রয়োজন দেখা দিল। এই উদ্দেশ্যেই আবিষ্কৃত হল কল-কারখানা। শুরু হল শিল্প-বিপ্লব। ধনী বণিকরা কল-কারখানা স্থাপন করে প্রচুর লাভ করতে থাকে। এদের নাম পুঁজিপতি। বণিক পুঁজিপতিদের প্রাধান্যের ফলে নানা কারণে ক্ষয়ে-আসা সামন্ত ব্যবস্থার পতন ঘটে। এদিকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়েছিল। তার জায়গায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালে জাতি

ভিত্তিক রাষ্ট্র দেখা গেল। কতকগুলি সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে একই ভাষাভাষী জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তাদের স্বার্থরক্ষার ভার নেয় শক্তিশালী রাজতন্ত্র। স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর অধীনস্থ নেদারল্যাণ্ডস-এর বাসিন্দাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ দিচ্ছিলেন না; বরং তাদের তিনি শাসন ব্যাপারেও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিলেন। এর প্রতিবাদে ডাচগণ অর্থাৎ নেদারল্যাণ্ডসের বাসিন্দারা বিদ্রোহ করে এবং দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীন হয়ে যায় (১৬৪৮ খ্রীঃ)। নূতন যুগের হাওয়ার ফলে জনগন আর স্বৈরচারী শাসন ব্যবস্থা সহ্য করতে রাজী ছিল না। ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা প্রথম চার্লস জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করে শাসন চালালে সেখানে গৃহযুদ্ধ (১৬৪২-১৬৪৫ খ্রীঃ) শুরু হয়ে যায়। জনগণের প্রতিনিধি পার্লামেন্ট রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁকে পরাজিত করে। শেষ পর্যন্ত রাজাকে হত্যা করে সাময়িক ভাবে ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় (১৬৪৯ খ্রীঃ)। এ সকল ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, জনগণ তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে কতটা সচেতন হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে ব্যক্তির কোন মর্যাদা বা ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের অবসানে এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভে সে তার মর্যাদা ফিরে পেল। সামন্ত যুগের শ্রেণী বৈষম্য সমাজকে আর বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারল না। মানুষ স্বেচ্ছায়, নিজেদের স্বার্থে সঙ্ঘবদ্ধ হল; শোষণ, অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শিখল এবং পুরাতন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নূতন যুগের সূচনা করল। এই নূতন যুগই আধুনিক যুগ।

কালপঞ্জী

	—চতুর্দশ—পঞ্চদশ শতক	মধ্যযুগের অবসান পর্ব
	—১৪৫৩	কনস্ট্যাণ্টিনোপলের পতন
খ্রীষ্টাব্দ	—১৬৪২—১৬৪৫	ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ
	—১৬৪৯	নেদারল্যাণ্ডস স্বাধীন
	১৬৫৯	ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র স্থাপন

সারসংক্ষেপ ● চতুর্দশ শতক থেকেই মধ্যযুগের অবসান শুরু হয়। নানা কারণে পশ্চিম ইউরোপের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের ঢেউ আসে। একেই রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বলা হয়। কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে এটি আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়। কারণ, পূর্ব সাম্রাজ্যের পণ্ডিতগণ ইটালীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গ্রীক-বিদ্যার প্রচারে তাঁরা অগ্রণী ছিলেন। রেনেসাঁর ফলে ইউরোপীয়গণ যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। শীঘ্রই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে তাদের অনেক উন্নতি হয়। বহু নূতন দেশও আবিষ্কৃত হয়েছিল। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে; উপনিবেশ স্থাপন ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতিও পরিলক্ষিত হয়। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন দেশে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটায় জনগণ সহজে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় আধুনিক যুগ।

অনুশীলনী

১। ইউরোপীয়দের জীবনে কিভাবে পরিবর্তন আসে? কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতন-এর ওপর কি প্রভাব বিস্তার করে?

২। রেনেসাঁর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

৩। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলাফল কি হয়েছিল?

৪। কোন্ কোন্ দেশে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে?

৫। নেদারল্যাণ্ডস্ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ কি?

৬। ইংলণ্ডে কেন গৃহযুদ্ধ হয়েছিল?

৭। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) কন্‌স্ট্যান্টিনোপল দখল করে —।

(খ) যুক্তিবাদ ছিল — প্রধান লক্ষণ।

(গ) ডাচগণ — খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে।

(ঘ) — খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

(ঙ) — শতক থেকেই মধ্যযুগের অবক্ষয় শুরু হয়।

(চ) এই বণিকগণই গড়ে তুলল — সম্প্রদায়।

(ছ) বণিক ও — প্রাধান্যের ফলে সামন্ত ব্যবস্থার পতন ঘটে।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক যুগকে ক'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়? তাদের নাম লেখ। মধ্যযুগের অবসান কোন্ যুগের শুরু? এখন কোন্ যুগ চলছে? ২। কোন্ কালটি মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে? ৩। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে কারা সভ্য দেশগুলিতে হানা দিতে থাকে? এর ফলে কি হয়েছিল? রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের পতন ঘটার কারণ কি? ৪। রোমান সাম্রাজ্য কখন দুভাগে বিভক্ত হয়েছিল? মধ্য যুগে পশ্চিম ইউরোপে যে নূতন সভ্যতা গড়ে ওঠে তাতে কোন্ কোন্ জাতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়?

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) ৪৭৬ থেকে — খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে — বলা হয়ে থাকে। (খ) মধ্যযুগে — কোন পৃথক মর্যাদা ছিল না। (গ) নূতন বিদ্যার প্রভাবে ইউরোপীয়গণ — ভাবে চিন্তা করতে শেখে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। কয়েকটি জার্মান জাতির নাম লেখ। রোমানগণ জার্মানদের 'বর্বর' বলত কেন? ২। কিভাবে রোমানদের সঙ্গে জার্মানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল? ৩। কোন্ সময়কে মাইগ্রেশন বা দেশান্তর গমনের যুগ বলা হয়? এটি বলার কারণ কি? ৪। অ্যাটিলার নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে কি জান? ৫। 'ভ্যাণ্ডালিজম' কথাটি কেন সৃষ্টি হয়েছিল? এর অর্থ কি? ৬। ট্যাসিটাস জার্মানদের সম্বন্ধে কি বলে গেছেন? ৭। জার্মানদের সমাজে কয় শ্রেণীর লোক ছিল? তাদের সম্পর্কে কি জান? ৮। জার্মানদের সভাগুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ। জার্মানদের কয়েকজন দেব-দেবীর নাম কর। তাঁদের নাম থেকে কি তৈরী হয়েছে? জার্মানদের দুটি কুসংস্কারের কথা লেখ।

৯। ঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ :

(ক) জার্মানগণ চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করত। (খ) জার্মানদের আগমনের ফলে পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। (গ) রোমান সেনাপতি ঈটিয়াস গেইসেরিককে পরাজিত করেন। (ঘ) দুধ, পনীর এবং

পিঠে ছিল জার্মানদের প্রধান খাদ্য। (ঙ) জার্মানগণ যোগ্যতম দলপতিকে রাজপদে নির্বাচিত করত। (চ) জার্মানদের ধর্ম-বিশ্বাস ছিল বেশ সহজ ও সরল। (ছ) গথ, ভ্যাণ্ডাল ও লম্বার্ডগণ অ্যারিয়ান ধর্মমতে দীক্ষিত হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

১। মধ্যযুগের কোন্ সময়টিকে অন্ধকার যুগ বলা যায়? জার্মানদের আক্রমণই কি রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ?

২। ভুল সংশোধন কর :—

(ক) কোন জার্মান রাজাই বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি। (খ) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে। (গ) রোমান ও হুনরা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। (ঘ) রোমান সম্রাটগণ অতি অল্প পরিমাণ কর আদায় করতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

১। কন্স্ট্যান্টাইন কোন্ সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন? তাঁর খ্যাতির দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ কর। ২। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে গ্রীক সাম্রাজ্য বলা হত কেন?

৩। সম্রাট কন্স্ট্যান্টাইন এর পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টানদের অবস্থা কেমন ছিল?

৪। কন্স্ট্যান্টাইন খ্রীষ্টধর্মকে বৈধ ধর্ম বলে মেনে নেন কেন?

৫। জাস্টিনিয়ান কিসের স্বপ্ন দেখতেন? তাঁর এই স্বপ্ন কতটা সফল হয়েছিল?

৬। রোমান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে জাস্টিনিয়ান তাঁর সাম্রাজ্যের কি কি ক্ষতি করেছিলেন?

৭। শুদ্ধ উত্তরটি খাতায় লেখ :—

(ক) খ্রীষ্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র ধর্ম বলে ঘোষণা করেন—কন্স্ট্যান্টাইন/থিয়োডোসিয়াস/গ্যালেরিয়াস।

(খ) জাস্টিনিয়ান দখল করার চেষ্টা করেন নি—স্পেন/ইটালী/গল ও ব্রিটেন।

(গ) জাস্টিনিয়ানের আইন সঙ্কলন গ্রন্থ বিভক্ত ছিল—আট/ছয়/চার অংশে।

পঞ্চম অধ্যায়

১। আরবদের পৌত্তলিক বলা হত কেন? তাদের প্রধান মন্দিরের নাম কি ছিল? এই মন্দিরে কি কি ছিল? মন্দিরটি কোথায় অবস্থিত? ২। হারুন-অল-রশীদ সম্পর্কে কি জান? ৩। আরব সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে ইউরোপের কি ক্ষতি হয়েছিল? আরবদের গলদেশ থেকে কে বিতাড়িত করেন? ৪। ইউরোপীয়গণ আরবদের কাছ থেকে কি কি শিখেছিল?

৫। বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) হজরত মহম্মদের স্ত্রীর নাম —। [রহিমা, ফতেমা, খাদিজা]

(খ) ঈশ্বরের বাণী লিপিবদ্ধ আছে —। [শারিয়তে, কোরাণ শরীফে, মকদ্দমায়]

(গ) হজরত মহম্মদের মৃত্যু ঘটে—খ্রীষ্টাব্দে। [৬২২, ৫৭০, ৬৩২]

(ঘ) আরব দার্শনিক—সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধর্মের আওতা থেকে মুক্ত করেছিলেন। [অল্‌-কিন্দি, ওমর খৈয়াল, ইব্‌ন রুশদ্‌]

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। "পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য" এই কথাটির অর্থ কি? এই নামকরণ কি যথার্থ? ২। শার্লেমেন-এর রাজ্যজয় সম্বন্ধে কি জান? ৩। শাসক হিসাবে শার্লেমেন-এর পরিচয় দাও। ৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

৫। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) অক্সফোর্ড কি? (খ) লে ইনভেষ্টিচারকে কে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন? (গ) কত খ্রীষ্টাব্দে ক্লুনীর মঠ স্থাপিত হয়েছিল?

সপ্তম অধ্যায়

১। সামন্তদের ক্ষমতা সম্পর্কে কি জান? ২। সামন্ত যুগের দুর্গ সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ। ৩। 'নাইট' বলতে কি বোঝ? নাইট হতে গেলে কি করতে হতো? ৪। নাইটগণ কি কি প্রতিজ্ঞা করত? ৫। শিভাল্‌রী সম্বন্ধে কি জান? এর গুরুত্ব কি? ৬। ম্যানরে কি কি থাকত?

অষ্টম অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) জেরুজালেম কোথায় অবস্থিত? (খ) সালাদিন কে ছিলেন?

(খ) প্রথম রিচার্ড কোন্‌ দেশের রাজা ছিলেন?

নবম অধ্যায়

১। মধ্যযুগের ইউরোপের কয়েকটি নগরের নাম লেখ। ২। নগরজীবনে কি কি অসুবিধা ছিল ?

দশম অধ্যায়

১। ভুল সংশোধন কর :—

(ক) হিউয়েন সাঙ একজন সম্রাট ছিলেন। (খ) সম্রাট সেন-সুং ছিলেন রক্ষণশীল সম্রাট। (গ) চাও চীনে সম্পত্তিকর বসান। (ঘ) জুমা কুয়াং ছিলেন একজন শিল্পী। (ঙ) মোঙ্গলরা ছিল আর্যজাতির একটি শাখা। (চ) জাপানের সীমান্ত অঞ্চলের সামন্তগণ প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল।

একাদশ অধ্যায়

টীকা লিখ :—(ক) মিহিরগুল (খ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (গ) দ্বিতীয় পুলকেশী (ঘ) পল্লব শিল্প।

দ্বাদশ অধ্যায়

দু'এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) অরেল স্টাইন কি আবিষ্কার করেন ? (খ) রমন্নদেশ কাকে বলা হয় ? (গ) ফু-নান কি ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও।

২। বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) মহম্মদ বিন তুঘলকের অভাব ছিল—। [পাণ্ডিত্যের, বাস্তববুদ্ধির, ধর্মনিষ্ঠার] (খ) ফারসী ভাষা ও পশ্চিমা হিন্দীর মিশ্রণে গড়ে ওঠে —। [বাংলা ভাষা, আরবী ভাষা, উর্দু ভাষা] (গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন —। [শ্রীচৈতন্য, মালাধর বসু, বড়ু চণ্ডীদাস]

চতুর্দশ অধ্যায়

সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) বিভিন্ন দেশ আবিষ্কারের ফলাফল কি হয়েছিল ? (খ) পুঁজিপতি কাদের বলা হয় ? (গ) নেদার ল্যাণ্ডস-এর বিদ্রোহের কারণ কি ? (ঘ) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের কারণ কি ? (ঙ) মধ্যযুগের অবসানে মানুষের মধ্যে কি পরিবর্তন দেখা দেয় ?